প্রবন্ধ

য়ুরোপ- প্রবাসীর পত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

2021

সূচিপত্র

- ভূমিকা 2
- উপহার 6
- য়ুরোপ- প্রবাসীর প্রথম পত্র 7
- য়ুরোপ- প্রবাসীর দ্বিতীয় পত্র 20
- য়ুরোপ- প্রবাসীর তৃতীয় পত্র 23
- য়ুরোপ- প্রবাসীর চতুর্থ পত্র 29
- য়ুরোপ- প্রবাসীর পঞ্চম পত্র 33
- য়ুরোপ- প্রবাসীর ষষ্ঠ পত্র 45
- য়ুরোপ- প্রবাসীর সপ্তম পত্র 55
- য়ুরোপ- প্রবাসীর অষ্টম পত্র 62
- য়ুরোপ- প্রবাসীর নবম পত্র 67
- য়ুরোপ- প্রবাসীর দশম পত্র 69

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত বন্ধুবরেষু

আমার বয়স ছিল সতেরো।পড়াশুনোয় ফাঁকি দিয়ে গুরুজনের উদ্‌বেগভাজন হয়েছি।মেজদাদা তখন আমেদাবাদে জজিয়তি করছেন।ভদ্রঘরের ছেলের মানরক্ষার উপযুক্ত ইংরেজি যে-করে-হোক জানা চাই; সেজন্য আমরা বিলেত-নির্বাসন ধার্য হয়েছে। মেজদাদার ওখানে কিছুদিন থেকে পত্তন করতে হবে তার প্রথম ভিত,হিতৈষীরা এই স্থির করেছেন। সিভিল সার্ভিসের রঙ্গভূমিতে আমরা বিলিতি কায়দায় নেপথ্যবিধান হল।

বালক-বয়সে আত্মপ্রকাশটা থাকে চাপা। জীবনে তখন উপরওলাদেরই আধিপত্য;চলৎশক্তির স্বাতন্ত্র্যটা দখল করে আদেশ উপদেশ অনুশাসন। স্বভাবত মেনে-চলবার মন আমার নয়,কিন্তু আমি ছিলুম ভোলা মনের মানুষ,আপন খেয়াল নিয়ে থাকতুম,আমাকে দেখতে হত নেহাত ভালোমানুষের মতো। ভাবীকালে বিস্তর কথাই কইতে হয়েছে,তার অঙ্কুরোদগম ছিল নিঃশব্দে।একদিন যখন বারান্দার রেলিং ধরে একলা চুপ করে বসে ছিলুম,পাশ দিয়ে যেতে যেতে বড়দাদা আমার মাথা নাড়া দিয়ে বললেন,রবি হবে ফিলজফর। চুপ করে থাকার খেতে ফিলজফি ছাড়াও অন্য ফসল ফলে।

খেতে প্রথম দেখা দিল কাঁটাগাছ,চাষ-না-করা জমিতে। বিশ্বকে খোঁচা মেরে আপন অস্তিত্ব প্রমান করবার সেই ঔদ্ধত্য। হরিণ-বালকের প্রথম শিং উঠলে তার যে চাল হয় সেই উগ্র চাল প্রথম কৈশোরের। বালক আপন বাল্যসীমা পেরোবার সময় সীমা লঙ্ঘন করতে চায় লাফ দিয়ে। তার পরিচয় শুরু হয়েছিল মেঘনাদবধকাব্যের সমালোচনা যখন লিখেছিলাম পনেরো বছর বয়সে। এই সময়েই যাত্রা করেছি বিলেতে। চিঠি যেগুলো লিখেছিলুম তাতে খাঁটি সত্য বলার চেয়ে খাঁটি স্পর্ধা প্রকাশ পেয়েছে প্রবল বেগে।বাঙালির ছেলে প্রথম বিলেতে গেলে তার ভালো লাগবার অনেক কারণ ঘটে। সেটা স্বাভাবিক,সেটা ভালোই। কিন্তু কোমর বেঁধে বাহাদুরি করবার প্রবৃত্তিতে পেয়ে বসলে উলটো মূর্তি ধরতে

সূচিপত্র

হয়।বল তে হয়,আমি অন্য পাঁচজনের মতো নই, আমার ভালো লাগবার যোগ্য কোথাও কিছুই নেই। সেটা যে চিত্তদৈন্যের লজ্জাকর লক্ষণ এবং অর্বাচীন মূঢ়তার শোচনীয় প্রমাণ,সেটা বোঝবার বয়স তখনো হয় নি।

সাহিত্য সাবালক হওয়ার পর থেকেই ঐ বইটার 'পরে আমার ধিক্‌কার জন্মেছিল। বুঝেছি,যে-দেশে গিয়েছিলুম সেখানকারই যে সম্মানহানি করা হয়েছে তা নয়,ওটাতে নিজেদেরই সম্মানহানি। বিস্তর লোকের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও বইটা প্রকাশ করি নি। কিন্তু আমি প্রকাশে বাধা দিলেই ওটা যে অপ্রকাশিত থাকবে এই কৌতূহলমুখর যুগে তা আশা করা যায় না। সেইজন্যে এ লেখার কোন্ কোন্ অংশে লেখক স্বয়ং গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য বলে স্বীকার করেছে সেটা জানিয়ে রেখে দিলুম।যথাসময়ে ময়লার ঝুলি হাতে আবর্জনা কুড়োবার লোক আসবে,বাজারে সেগুলো বিক্রি হবার আশঙ্কাও যথেষ্ট আছে। অনেক অপরাধের অনেক প্রায়শ্চিত্ত বাকি থাকে ইহলোক প্রেতলোকে সেগুলো সম্পূর্ণ হতে থাকে।

এই বইটাকে সাহিত্যের পঙ্‌ক্তিতে আমি বসাতে চাই,ইতিহাসের পঙ্‌ক্তিতে নয়।পাঠ্য জিনিসেরই মূল্য সাহিত্যে,অপাঠ্য জিনিসেরও মূল্য ইতিহাসে। ঐতিহাসিককে যদি সম্পূর্ণ বঞ্চিত করতে পারতুম তবে আমার পক্ষে সেটা পূণ্যকর্ম,সুতরাং মুক্তির পথ হত। নিজের কাব্য সম্বন্ধে এই ত্যাগের সাধনায় প্রবৃত্ত হতে বার বার সংকল্প করেছি। কিন্তু দুর্বল মন সংঘবদ্ধ আপত্তির বিরুদ্ধে ব্রতপালন করতে পারি নি।বাছাই করবার ভার দিতে হল পরশুপাণি মহাকালের হাতে। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের যুগে মহাকালেরও কর্তব্যে ত্রুটি ঘটছে। বইগুলির বৈষয়িক স্বত্ব হারিয়েছি বলে আরো দুর্বল হতে হল আমাকে।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রশ্রেণী আগাগোড়া অরক্ষণীয়া নয়। এর স্বপক্ষে একটা কথা আছে সে হচ্ছে এর ভাষা।নিশ্চিত বলতে পারি নে কিন্তু আমার বিশ্বাস,বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষার লেখা বই এই প্রথম। আগ এর বয়স হল ষাট। সে-ক্ষেত্রেও আমি ইতিহাসের দোহাই দিয়ে কৈফিয়েত দাখিল করব না। আমার বিশ্বাস বাংলা চলতি ভাষার সহজ প্রকাশপটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যেই আছে।

তার পর লেখার জঙ্গলগুলো সাফ করবামাত্র দেখা গেল,এর মধ্যে শ্রদ্ধা বস্তুটাই ছিল গোপনে,অশ্রদ্ধাটা উঠেছিল বাহিরে আগাছার মতো নিবিড় হয়ে। আসল জিনিসটাকে তারা আচ্ছন্ন করেছিল, কিন্তু নষ্ট করে নি। এইটে আবিষ্কার

করে আমার মন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছে। কেননা,নিন্দা-নৈপুণ্যের প্রাখর্য ও চাতুর্যকে আমি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। ভালো লাগাবার শক্তিই বিধাতার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার মানবজীবনে। সাহিত্যে কুৎসাবিলাসীদের ভোজের দাদন আমি নিই নি,আর কিছু না হোক, এই পরিচয়টুকু আমি রেখে যেতে চাই।

একটা কথা আপনাকে বলা বাহুল্য। ইংরেজের চেহারা সেদিন আমার চোখে যেমনটা ধরা পড়েছিল সেটা যে নেহাত আমার বাল্যবুদ্ধি ও অনভিজ্ঞতার সৃষ্টি সে কথা বললে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলা হবে না।এই প্রায় ষাট বছরের মধ্যে সেখানকার মানুষের যে পরিবর্তন হয়েছে তাকে ক্রমশ অভিব্যক্তির আখ্যা দেওয়া যায় না।এক-এক সময়ে ইতিহাস-শতরঞ্চের বোড়ে তার এক পা চাল ছেড়ে দিয়ে লম্বা চালে চলতে শুরু করে। পাশ্চাত্যে তাই ঘটেছে। সেদিনকার পাসপোর্টে তার যে ছবিটা ছিল সে ছবি আজ একেবারেই চলবে না।

সেই প্রথম-বয়সে যখন ইংলন্ডে গিয়েছিলুম ঠিক মুসাফেরের মতো যাই নি। অর্থাৎ রাস্তা থেকে চলতে চলতে বাহির থেকে চোখ বুলিয়ে যাওয়া বরাদ্দ ছিল না। ছিলেন অতিথির মতো,ঘরের মধ্যে প্রবেশ পেয়েছিলুম।সেবা পেয়েছি,স্নেহ পেয়েছি,কোথাও কোথাও ঠকেছি,দুঃখ পেয়েছি।কিন্তু তার পরে আবার যখন সেখানে গিয়েছি,তখন সভায় থেকেছি,ঘরে নয়। আমার তৎপূর্বকালের অভিজ্ঞতা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ যদি না হয় তবু সত্য। যে ডাক্তারের বাড়িতে ছিলুম তিনি ভদ্রশ্রেণীর এবং শ্রদ্ধেয়, কিন্তু সমুদয় ভদ্রশ্রেণীর প্রতীক তিনি না হতে পারেন। ইংলন্ডে আজও বর্ণসাম্য যতই থাক্ শ্রেণীভেদ যথেষ্ট। সেখানে এক শ্রেণীর সঙ্গে আর-এক শ্রেণীর মনোবৃত্তি ও ব্যবহারের মিল না থাকাই স্বাভাবিক। সেদিনও নিঃসন্দেহ ছিল না। আমি সেদিনকার সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের এবং একটি বিলাসিনী-ঘরের পরিচয় কাছে থেকেই পেয়েছি। তার কিছু কিছু বর্ণনা চিঠিগুলির মধ্যে আছে।

কয়েকটি চিঠিতে তখনকার দিনের ইঙ্গবঙ্গের বিবরণ কিছু বিস্তারিত করেই দিয়েছি। আজ এরা লুপ্ত জীব। কোথাও কোথাও তার বর্তমান অভিব্যক্তির কিছু কিছু চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়,এমন-কি,যাঁরা বিলেতে যান নি তাঁদেরও কারও কারও চালচলনে ইঙ্গবঙ্গী লক্ষণ অকস্মাৎ ফুটে ওঠে। সেকালের ইঙ্গবঙ্গদের অনেককে আমি প্রত্যক্ষ জানতুম। তাঁদের অনেকখানি পরিচয় পেয়েছি তাঁদের নিজেরই মুখ থেকে। যদি এর মধ্যে কোনো অত্যুক্তি থাকে সে তাঁদেরই

স্বকৃত।আমর সামনে বর্ণনায় নিজেদেরও বে-আবরু করতে ভয় পায় নি,যেহেতু মুখচোরা ভালোমানুষ বালকটিকে তাঁরা বিপদ্‌জনক বলে সন্দেহ করেন নি। আজ তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইতে গেলে আরো কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে। তাঁরা আছেন বৈতরণীর পরপারে।

আমার বিলাতের চিঠিতে 'এবার মলে সাহেব হব' গানটি উদ্‌ধৃত করেছিলেম। আমার স্নেহভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের দৃষ্টান্তস্বরূপ ঐ গানটা আমার রচনা বলে প্রচার করেছেন। তাতে অনামা রচয়িতার মান বেঁচে গেছে,কিন্তু আমরা বাঁচে নি। আমার বিশ্বাস যথোচিত গবেষণা করলে আমার লেখা থেকে ওর চেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতেও পারে।

এই পত্রগুলি যখন লেখা হয়েছিল তার বারো বছর পরে আর-এক বার বিলেতে গিয়েছিলেম। তখনো দেশের বদল খুব বেশি হয় নি।সেদিন যে ডায়ারি লিখেছি তাতে আছে আঁচড়কাটা ছবি-- এক্কাগাড়িতে চলতে চলতে আশেপাশে এক-নজরে দেখার দৃশ্য।

বইগুলির পুনঃসংস্করণের মুখবন্ধে এই চিঠিখানি আপনাকে সম্বোধন করে লিখছি। তার কারণ,বিলেত সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা অনেক প্রশস্ত ও গভীর– সেই ভূমিকার উপর রেখে এই চিঠিগুলি ও ডায়ারির যথাযোগ্য স্থান নির্ণয় করতে পারবেন এবং ভুলত্রুটি ও অতিভাষণের অপরিহার্যতা অনুমান করে ক্ষমা করাও আপনার পক্ষে কঠিন হবে না।

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উপহার

ভাই জ্যোতিদাদা,

ইংলন্ডে যাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত
তাঁহারই হস্তে এই পুস্তকটি
সমর্পণ করিলাম।

স্নেহভাজন
রবি

য়ুরোপ-প্রবাসীর প্রথম পত্র

বিশে সেপ্টেম্বরে আমরা ‘পুনা’ স্টীমারে উঠলেম। পাঁচটার সময় জাহাজ ছেড়ে দিলে। আমরা তখন জাহাজের ছাতে দাঁড়িয়ে। আস্তে আস্তে আমাদের চোখের সামনে ভারতবর্ষের শেষ তটরেখা মিলিয়ে গেল। চারিদিকের লোকের কোলাহল সইতে না পেরে আমি আমার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেম। গোপন করবার বিশেষ প্রয়োজন দেখছিনে, আমার মনটা বড়োই কেমন নির্জীব, অবসন্ন, ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিল, কিন্তু দূর হোক্ গে-ও-সব করুণরসাত্মক কথা লেখবার অবসরও নেই ইচ্ছেও নেই; আর লিখলেও হয় তোমার চোখের জল থাকবে না, নয় তোমার ধৈর্য থাকবে না।

সমুদ্রের পায়ে দণ্ডবৎ। ২০শে থেকে ২৬শে পর্যন্ত যে করে কাটিয়েছি তা আমিই জানি। ‘সমুদ্রপীড়া’ কাকে বলে অবিশ্যি জানো কিন্তু কী রকম তা জান না। আমি সেই ব্যামোয় পড়েছিলেম, সে-কথা বিস্তারিত করে লিখলে পাষাণেরও চোখে জল আসবে। ছটা দিন, মশায়, শয্যা থেকে উঠি নি। যে ঘরে থাকতেম, সেটা অতি অন্ধকার, ছোটো, পাছে সমুদ্রের জল ভিতরে আসে তাই চারদিকের জানলা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। অসূর্যম্পশ্যরূপ ও অবায়ুস্পর্শদেহ হয়ে ছয়টা দিন কেবল বেঁচে ছিলেম মাত্র। প্রথম দিন সন্ধ্যেবেলায় আমাদের একজন সহযাত্রী আমাকে জোর করে বিছানা থেকে উঠিয়ে খাবার টেবিলে নিয়ে গেলেন। যখন উঠে দাঁড়ালেম তখন আমার মাথার ভিতর যা-কিছু আছে সবাই মিলে যেন মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ করে দিলে, চোখে দেখতে পাই নে, পা চলে না, সর্বাঙ্গ টলমল করে! দু-পা গিয়েই একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লেম। আমার সহযাত্রীটি আমাকে ধরাধরি করে জাহাজের ডেক-এ অর্থাৎ ছাতে নিয়ে গেলেন। একটা রেলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেম। তখন অন্ধকার রাত। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। আমাদের প্রতিকূলে বাতাস বইছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে সেই নিরাশ্রয় অকূল সমুদ্রে দুই দিকে অগ্নি উৎক্ষিপ্ত করতে করতে আমাদের জাহাজ একলা চলেছে; যেখানে চাই সেইদিকেই অন্ধকার, সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠছে—সে এক মহা গম্ভীর দৃশ্য।

সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারলেম না। মাথা ঘুরতে লাগল। ধরধরি করে আবার আমার ক্যাবিনে এলেম। সেই যে বিছানায় পড়লেম, ছ-দিন আর এক মুহূর্তের জন্যও মাথা তুলি নি। আমাদের যে স্টুঅর্ড ছিল (যাত্রীদের সেবক)—কারণ জানি নে—আমার উপর তার বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। দিনের মধ্যে যখন-তখন সে আমার জন্যে খাবার নিয়ে উপস্থিত করত; না খেলে কোনোমতেই ছাড়ত না। সে বলত, না খেলে আমি ইঁদুরের মতো দুর্বল হয়ে পড়ব (weak as a rat)। সে বলত, সে আমার জন্যে সব কাজ করতে পারে। আমি তাকে যথেষ্ট সাধুবাদ দিতেম, এবং জাহাজ ছেড়ে আসবার সময় সাধুবাদের চেয়ে আরো কিঞ্চিৎ সারবান পদার্থ দিয়েছিলেম।

ছ-দিনের পর আমরা যখন এডেনের কাছাকাছি পৌঁছলেম, তখন সমুদ্র কিছু শান্ত হল। সেদিন আমার স্টুঅর্ড এসে নড়ে চড়ে বেড়াবার জন্যে আমাকে বার বার অনুরোধ করতে লাগল। আমি তার পরামর্শ শুনে বিছানা থেকে তো উঠলেম, উঠে দেখি যে সত্যিই ইঁদুরের মতো দুর্বল হয়ে পড়েছি। মাথা যেন ধার-করা, কাঁধের সঙ্গে তার ভালো রকম বনে না; চুরি-করা কাপড়ের মতো শরীরটা যেন আমার ঠিক গায়ে লাগছে না। ঘর থেকে বেরিয়ে ছাতের উপর গিয়ে একটা কেদারায় হেলান দিয়ে পড়লেম। অনেক দিনের পর বাতাস পেয়ে বাঁচলেম। দুপুরবেলা দেখি একটা ছোটো নৌকা সেই সমুদ্র দিয়ে চলেছে। চারদিকে অনেক দূর পর্যন্ত আর ডাঙা নেই, জাহাজসুদ্ধ লোক অবাক। তারা আমাদের স্টীমারকে ডাকতে আরম্ভ করলে, জাহাজ থামল। তারা একটি ছোটো নৌকায় করে কতকগুলি লোক জাহাজে পাঠিয়ে দিলে। এরা সকলে আরবদেশীয়, এডেন থেকে মস্কটে যাচ্ছে। পথের মধ্যে দিক্‌ভ্রম হয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে যা জলের পিপে ছিল, তা ভেঙে গিয়ে জল সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে, অথচ যাত্রী অনেক। আমাদের জাহাজের লোকেরা তাদের জল দিলে। একটি ম্যাপ খুলে কোন্ দিকে ও কত দূরে মস্কট, তাদের দেখিয়ে দিলে, তারা আবার চলতে লাগল। সে নৌকো যে মস্কট পর্যন্ত পৌঁছবে তাতে সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগল।

২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি, আমাদের সম্মুখে সব পাহাড়-পর্বত উঠেছে। অতি সুন্দর পরিষ্কার প্রভাত, সূর্য সবেমাত্র উঠেছে, সমুদ্র অতিশয় শান্ত। দূর থেকে সেই পর্বতময় ভূভাগের প্রভাতদৃশ্য এমন সুন্দর দেখাচ্ছে যে কী বলব। পর্বতের উপর রঙিন মেঘগুলি এমন নত হয়ে পড়েছে যে, মনে হয় যেন অপরিমিত সূর্যকিরণ পান করে তাদের আর দাঁড়াবার শক্তি নেই, পর্বতের উপরে যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে। আয়নার মতো পরিষ্কার শান্ত সমুদ্রের উপর ছোটা ছোটো পাল তোলা নৌকোগুলি আবার কেমন ছবির মতো দেখাচ্ছে।

এডেনে পৌঁছে বাড়ীতে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেম কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখি যে এই ক-দিন নাড়াচাড়া খেয়ে মাথার ভিতরে যেন সব উল্‌টোপাল্‌টা হয়ে গেছে, বুদ্ধির রাজ্যে একটা অরাজকতা ঘটেছে। কী করে লিখব, ভালো মনে আসছে না। ভাবগুলো যেন মাকড়সার জালের মতো, ছুঁতে গেলেই অমনি ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে। কিসের পর কী লিখব, তার একটা ভালোরকম বন্দোবস্ত করতে পারছি নে। এই অবস্থায় লিখতে আরম্ভ করলেম, এমন বিপদে পড়ে তোমাকে যে লিখতে পারি নি তাতে তোমার ক্ষোভের কারণ কিছুই নেই।

দেখো, সমুদ্রের উপর আমার কতকটা অশ্রদ্ধা হয়েছে। কল্পনায় সমুদ্রকে যা মনে করতেম, সমুদ্রে এসে দেখি তার সঙ্গে অনেক বিষয় মেলে না। তীর থেকে সমুদ্রকে খুব মহান বলে মনে হয়, কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে এলে আর ততটা হয় না। তার কারণ আছে; আমি যখন বম্বের উপকূলে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতেম, তখন দেখতেম দূরদিগন্তে গিয়ে নীল জল নীল আকাশে মিশিয়ে গিয়েছে, কল্পনায় মনে করতেম যে, এক বার যদি ঐ দিগন্তের আবরণ ভেদ করতে পারি, ও দিগন্তের যবনিকা ওঠাতে পারি, অমনি আমার সুমুখে এক অকূল অনন্ত সমুদ্র একেবার উথলে উঠবে। ঐ দিগন্তের পরে যে কী আছে তা আমার কল্পনাতেই থাকত; তখন মনে হত না, ঐ দিগন্তের পরে আর-এক দিগন্ত আসবে। কিন্তু যখন সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়ি, তখন মনে হয় যে, জাহাজ যেন চলছে না, কেবল একটি দিগন্তের গণ্ডির মধ্যে বাঁধা আছে। আমাদের কল্পনার পক্ষে সে দিগন্তের সীমা এত সংকীর্ণ যে কেমন তৃপ্ত হয় না। কিন্তু দেখো, এ কথা বড়ো গোপনে রাখা উচিত; বাল্মীকি থেকে বায়রন পর্যন্ত সকলেরই যদি এই সমুদ্র দেখে ভাব লেগে থাকে, তবে আমার না লাগলে দশজনে যে হেসে উঠবে; গ্যালিলিওর সময়ে এ-কথা বললে হয়তো

আমাকে কয়েদ যেতে হত। এত কবি সমুদ্রের স্তুতিবাদ করেছেন যে আজ আমার এই নিন্দায় তাঁর বোধ হয় বড়ো একটা গায়ে লাগবে না। যখন তরঙ্গ ওঠে, তখন বোধ করি সমুদ্র বেশ দেখায়, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সমুদ্রের তরঙ্গ উঠলেই আমার এমন মাথা ঘুরতে থাকে যে আমার দেখাশুনো সব ঘুরে যায়।

আমি যখন ঘর থেকে বেরোতে আরম্ভ করলেম, তখন জাহাজের যাত্রীদের উপর আমার নজর পড়ল ও আমার উপর জাহাজের যাত্রীদের নজর পড়ল। আমি স্বভাবতই 'লেডি' জাতিকে বড়ো ডরাই। তাঁদের কাছে ঘেঁষতে গেলে এত প্রকার বিপদের সম্ভাবনা যে, চাণক্য পণ্ডিত থাকলে লেডিদের কাছ থেকে দশ সহস্র হস্ত দূরে থাকতে পরামর্শ দিতেন। এক তো মনোরাজ্যে নানাপ্রকার শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা—তা ছাড়া সর্বদাই ভয় হয় পাছে কী কথা বলতে কী কথা বলে ফেলি, আর আমাদের অসহিষ্ণু লেডি তাঁদের আদবকায়দার তিলমাত্র ব্যতিক্রম সইতে না পেরে দারুণ ঘৃণায় ও লজ্জায় একেবারে অভিভূত হন। পাছে তাঁদের গাউনের অরণ্যের মধ্যে ভ্যাবাচেকা খেয়ে যাই, পাছে আহারের সময় তাঁদের মাংস কেটে দিতে হয়, পাছে মুরগির মাংস কাটতে গিয়ে নিজের আঙুল কেটে বসি—এইরকম সাত-পাঁচ ভেবে আমি জাহাজের লেডিদের কাছ থেকে অতি দূরে থাকতেম। আমাদের জাহাজে লেডির অভাব ছিল না, কিন্তু জেন্টলম্যানেরা সর্বদা খুঁত খুঁত করতেন যে, তার মধ্যে অল্পবয়স্কা বা সুশ্রী এক জনও ছিল না।

পুরুষ যাত্রীদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। ব—মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁর কথা অনর্গল, হাসি অজস্র, আহার অপরিমিত। সকলের সঙ্গেই তাঁর আলাপ, সকলের সঙ্গেই তিনি হাসিতামাশা করে বেড়ান। তাঁর একটা গুণ আছে, তিনি কখনো বিবেচনা করে, মেজে ঘষে কথা কন না; ঠাট্টা করেন, সকল সময়ে তার মানে না থাকুক, তিনি নিজে হেসে আকুল হন। তিনি তাঁর বয়সের ও পদমানের গাম্ভীর্য বুঝে হিসাব করে কথা কন না, মেপে জুকে হাসেন না ও দু-দিক বজায় রেখে মত প্রকাশ করেন না, এই সকল কারণে তাঁকে আমার ভালো লাগত। কত প্রকার যে ছেলেমানুষি করেন তার ঠিক নেই। বৃদ্ধত্বের বুদ্ধি ও বালকত্বের সাদাসিদা নিশ্চিন্ত ভাব একত্রে দেখলে আমার বড়ো ভালো লাগে। আমাকে তিনি 'অবতার' বলতেন, গ্রেগরি সাহেবকে 'গড়গড়ি' বলতেন, আর-এক যাত্রীকে 'রুহি মৎস্য' বলে ডাকতেন; সেবেচারির অপরাধ কী

তা জান? সাধারণ মানুষদের চেয়ে তার ঘাড়ের দিকটা কিছু খাটো ছিল, তার মাথা ও শরীরের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র যোজক পদার্থ ছিল না বললেও হয়। এই জন্যে ব– মহাশয় তাকে মৎস্যশ্রেণীভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু আমি যে কেন অবতারশ্রেণীর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেম, তার কারণ সহজে নির্দেশ করা যায় না।

আমাদর জাহাজের T–মহাশয় কিছু নূতন রকমের লোক। তিনি ঘোরতম ফিলজফর মানুষ। তাঁকে কখনো চলিত ভাষায় কথা কইতে শুনি নি। তিনি কথা কইতেন না, বক্তৃতা দিতেন। একদিন আমরা দু-চার জনে মিলে জাহাজের ছাতে দু-দণ্ড আমোদপ্রমোদ করছিলেম, এমন সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে ব–মহাশয় তাঁকে বললেন, ‘কেমন সুন্দর তারা উঠেছে’। এই আমাদের ফিলজফর তারার সঙ্গে মানুষ্য-জীবনের সঙ্গে একটা গভীর সম্বন্ধ বাধিয়ে দিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেম– আমরা “মূর্খেতে চাহিয়া থাকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া” রইলেম।

আমাদের জাহাজে একটি আস্ত জনবুল ছিলেন। তাঁর তালবৃক্ষের মতো শরীর, ঝাঁটার মতো গোঁফ, শজারুর কাঁটার মতো চুল, হাঁড়ির মতো মুখ, মাছের চোখের মতো ম্যাডমেড়ে চোখ, তাঁকে দেখলেই আমার গা কেমন করত, আমি পাঁচ হাত তফাতে সরে যেতেম। এক-এক জন কোনো অপরাধ না করলেও তার মুখশ্রী যেন সর্বদা অপরাধ করতে থাকে। প্রত্যহ সকালে উঠেই শুনতে পেতেম তিনি ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, হিন্দুস্থানি প্রভৃতি যত ভাষা জানেন সমস্ত ভাষায় জাহাজের সমস্ত চাকরবাকরদের অজস্র গাল দিতে আরম্ভ করেছেন, ও দশ দিকে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছেন। তাঁকে কখনো হাসতে দেখি নি; কারো সঙ্গে কথা নেই বার্তা নেই, আপনার ক্যাবিনে গোঁ হয়ে বসে আছেন। কোনো কোনো দিন ডেক-এ বেড়াতে আসতেন, বেড়াতে বেড়াতে যার দিকে একবার কৃপাকটাক্ষে নেত্রপাত করতেন, তাকে যেন পিঁপড়াটির মতো মনে করতেন।

প্রত্যহ খাবার সময় ঠিক আমার পাশে B–বসতেন। তিনি একটি ইয়ুরাশীয়। কিন্তু তিনি ইংরেজের মতো শিস দিতে, পকেটে হাত দিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়াতে সম্পূর্ণরূপে শিখেছেন। তিনি আমাকে বড়োই অনুগ্রহের চোখে দেখতেন। একদিন এসে মহাগম্ভীর স্বরে বললেন, “ইয়ং ম্যান্, তুমি অক্সফোর্ড যাচ্ছ? অক্সর্ফোড য়ুনিভার্সিটি বড়ো ভালো বিদ্যালয়।” আমি একদিন ট্রেঞ্চ সাহেবের “Proverbs and Their Lessons” বইখানি পড়ছিলেম, তিনি এসে বইটি নিয়ে শিস দিতে দিতে

দু-চার পাত উলটিয়ে পালটিয়ে বললেন, “হাঁ, ভালো বই বটে।” ট্রেঞ্চের শুভাদৃষ্ট! আমার উপর তাঁর কিছু মুরব্বিয়ানা ব্যবহার ছিল।

এডেন থেকে সুয়েজে যেতে দিন পাঁচক লেগেছিল। যারা ব্রিন্দিসি-পথ দিয়ে ইংলণ্ডে যায় তাদের জাহাজ থেকে নেবে সুয়েজে রেলওয়ের গাড়িতে উঠে আলেকজান্দ্রিয়াতে যেতে হয়; আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরে তাদের জন্যে একটা স্টীমার অপেক্ষা করে—সেই স্টীমারে চচড়ে ভূমধযসাগর পার হয়ে ইটালিতে পৌঁছতে হয়। আমরা overland-পেরোনো যাত্রী, সুতরাং আমাদের সুয়েজে নাবতে হল। আমরা তিনজন বাঙালি ও একজন ইংরেজ একখানি আরব নৌকো ভাড়া করলেম। মানুষের “divine” মুখশ্রী কতদূর পশুত্বের দিকে নাবতে পারে, তা সেই নৌকোর মাঝিটার মুখ দেখলে জানতে পারতে। তার চোখ দুটো যেন বাঘের মতো, কাল কুচকুচে রং, কপাল নিচু, ঠোঁট পুরু, সবসুদ্ধ মুখের ভাব অতি ভয়ানক। অন্যান্য নৌকোর সঙ্গে দরে বনল না, সে একটু কম দামে নিয়ে যেতে রাজি হল। ব—মহাশয় তো সে নৌকোয় বড়ো সহজে যেতে রাজি নন; তিনি বললেন আরবদের বিশ্বাস করতে নেই—ওরা অনায়াসে গলায় ছুরি দিতে পারে। তিনি সুয়েজের দুই-একটা ভয়ানক ভয়ানক অরাজকতার গল্প করলেন। কিন্তু যা হক, আমরা সেই নৌকোয় তো উঠলেম। মাঝিরা ভাঙা ভাঙা ইংরেজি কয়, ও অল্পস্বল্প ইংরেজি বুঝতে পারে। আমরা তো কতক দূর নির্বিবাদে গেলেম। আমাদের ইংরেজ যাত্রীটির সুয়েজের পোস্ট আপিসে নাববার দরকার ছিল। পোস্ট আপিস অনেক দূর এবং যেতে অনেক বিলম্ব হবে, তাই মাঝি একটু আপত্তি করলে; কিন্তু শীঘ্রই সে আপত্তি ভঞ্জন হল। তার পরে আবার কিছু দূরে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে “পোস্ট আপিসে যেতে হবে কি? সে দুই-এক ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া অসম্ভব।”—আমাদের রুক্ষস্বভাব সাহেবটি মহা ক্ষাপা হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, “your grandmother”। এই তো আমাদের মাঝি রুখে উঠলেন, “what? mother? mother? What mother, don’t say mother”। আমরা মনে করলুম

সাহেবটাকে ধরে বুঝি জলে ফেলে দিলে, আবার জিজ্ঞাসা করলে, “what did say? (কী বললি?)” সাহেব তাঁর রোখ ছাড়ালেন না। আবার বললেন “your grandmother”। এই তো আর রক্ষা নেই, মাঝিটা মহা তেড়ে উঠল। সাহেব গতিক ভালো নয় দেখে নরম হয়ে বললেন, “you don’t seem to understand what I say!” অর্থাৎ তিনি তখন grandmother বলাটা যে গালি নয় তাই প্রমাণ করতে ব্যস্ত। তখন সে মাঝিটা ইংরেজি ভাষা ছেড়ে ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল “বস–চুপ।” সাহেব থতমত খেয়ে চুপ করে গেলেন, আর তাঁর বাক্যস্ফুর্তি হল না। আবার খানিক দূর গিয়ে সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন “কত দূর বাকি আছে?” মাঝি অগ্নিশর্মা হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, “Two shilling give, ask what distance!” আমরা এই রকম বুঝে গেলেম যে, দু-শিলিং ভাড়া দিলে সুয়েজ-রাজ্যে এই রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আইনে নেই! মাঝিটা যখন আমাদের এইরকম ধমক দিচ্ছে তখন অন্য অন্য দাঁড়িদের ভারি আমোদ বোধ হচ্ছে, তারা তো পরস্পর মুখচাওয়াচাওয়ি করে মুচকি মুচকি হাসি আরম্ভ করলে। মাঝিমহাশয়ের বিষম বদমেজাজ দেখে তাদের হাসি সামলানো দায় হয়ে উঠেছিল। একদিকে মাঝি ধমকাচ্ছে, একদিকে দাঁড়িগুলো হাসি জুড়ে দিয়েছে, মাঝিটির উপর প্রতিহিংসা তোলবার আর কোনো উপায় না দেখে আমরাও তিনজনে মিলে হাসি জুড়ে দিলেম–এ রকম সুবুদ্ধি অনেক স্থলে দায়ে পড়ে খাটাতে হয়। মানে মানে সুয়েজ শহরে গিয়ে তো পৌঁছলেম। সুয়েজ শহর সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার অধিকার নেই, কারণ আমি সুয়েজের আধ মাইল জায়গার বেশি আর দেখি নি। শহরের চারদিকে একবার প্রদক্ষিণ করবার বাসনা ছিল, কিন্তু আমার সহযাত্রীদের মধ্যে যাঁরা পূর্বে সুয়েজ দেখেছিলেন, তাঁরা বললেন, “এ পরিশ্রমে শ্রান্তি ও বিরক্তি ছাড়া অন্য কোনা ফললাভের সম্ভাবনা নেই।” তাতেও আমি নিরুৎসাহ হই নি কিন্তু শুনলেম গাধায় চড়ে বেড়ানো ছাড়া শহরে বেড়াবার আর কোনো উপায় নেই। শুনে শহরে বেড়াবার দিকে টান আমার অনেকটা কমে গেল, তার

পরে শোনা গেল, এ-দেশের গাধাদের সঙ্গে চালকদের সকল সময়ে মতের ঐক্য হয় না, তারও একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ইচ্ছে আছে; এইজন্যে সময়ে সময়ে দুই ইচ্ছের বিরোধ উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রায় দেখা যায়, গাধার ইচ্ছে পরিণামে জয়ী হয়। সুয়েজে একপ্রকার জঘন্য চোখের ব্যামোর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব—রাস্তায় অমন শত শত লোকের চোখ ঐরকম রোগগ্রস্ত দেখতে পাবে। এখানকার মাছিরা ঐ রোগ চারদিকে বিতরণ করে বেড়ায়। রোগগ্রস্ত চোখ থেকে ঐ রোগের বীজ আহরণ করে তারা অরুগ্ন চোখে গিয়ে বসে, চারিদিকে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সুয়েজে আমরা রেলগাড়িতে উঠলেম। এ রেলগাড়ির অনেকপ্রকার রোগ আছে, প্রথমত শোবার কোনো বন্দোবস্ত নেই, কেন না বসবার জায়গাগুলি অংশে অংশে বিভক্ত, দ্বিতীয়ত এমন গজগামিনী রেলগাড়ি সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায় না। সমস্ত রাত্রিই গাড়ি চলেছে, দিনের বেলা যখন জেগে উঠলেম তখন দেখলেম ধুলোয় আমাদের কেবল গোর হয় নি, আর সব হয়েছে। চুলে হাত দিতে গিয়ে দেখি, চুলে এমন এক স্তর মাটি জমেছে যে, মাথায় অনায়াসে ধান চাষ করা যায়। এইরকম ধুলোমাখা সন্ন্যাসীর বেশে আমরা আলেকজান্দ্রিয়াতে গিয়ে পৌঁছলেম। রেলের লাইনের দুধারে সবুজ শস্যক্ষেত্র। জায়গায় জায়গায় খেজুরের গাছে থোলো থোলো খেজুর ফলে রয়েছে। মাঠের মাঝে মাঝে কুয়ো। মাঝে মাঝে দুই-একটা কোঠাবাড়ি—বাড়িগুলো চৌকোনা, থাম নেই, বারান্দা নেই—সমস্তটাই দেয়ালের মতো, সেই দেয়ালের মধ্যে মধ্যে দুই-একটা জানলা। এই সকল কারণে বাড়িগুলোর যেন শ্রী নেই। যা হোক আমি আগে আফ্রিকার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যে রকম অনুর্বর মরুভূমি মনে করে রেখেছিলুম, চারদিক দেখে তা কিছুই মনে হল না। বরং চার দিককার সেই হরিৎ ক্ষেত্রের উপর খেজুরকুঞ্জের মধ্যে প্রভাতটি আমার অতি চমৎকার লেগেছিল।

আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে আমাদের জন্য 'মঙ্গোলিয়া' স্টীমার অপেক্ষা করছিল। এইবার আমরা ভূমধ্যসাগরের বক্ষে আরোহণ করলেম। আমার একটু শীত-শীত করতে লাগল। জাহাজে গিয়ে খুব ভাল করে স্নান করলেম, আমার তো হাড়ে হাড়ে ধুলো প্রবেশ করেছিল। স্নান করার পর আলেকজান্দ্রিয়া শহর দেখতে গেলেম। জাহাজ থেকে ডাঙা পর্যন্ত যাবার জন্যে একটা নৌকো ভাড়া হল। এখানকার এক-একটা মাঝি সার উইলিম জোন্‌সের দ্বিতীয় সংস্কণর বললেই হয়। তারা গ্রীক, ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি প্রভৃতি অনেক ভাষায় চলনসই রকম কথা কইতে পারে। শুনলেম ফ্রেঞ্চ ভাষাই এখানকার সাধারণ ভাষা। রাস্তাঘাটের নাম, সাইনবোর্ডে দোকানগুলির আত্মপরিচয়, অধিকাংশই ফরাসি ভাষায় লেখা। আলেকজান্দ্রিয়া শহরটি সমৃদ্ধিশালী মনে হল। এখানে যে কত জাতের লোক ও কত জাতের দোকানবাজার আছে তার ঠিকানা নেই। রাস্তাগুলি পাথর দিয়ে বাঁধানো, তাতে বেশ পরিষ্কার থাকে, কিন্তু গাড়ির শব্দ বড়ো বেশি রকম হয়। খুব বড়ো বড়ো বাড়ি, বড়ো বড়ো দোকান, শহরটি খুব জমকালো বটে। আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দর খুব প্রকাণ্ড। বিস্তর জাহাজ এখানে আশ্রয় পায়। য়ুরোপীয়, মুসলমান, সকল প্রকার জাতিরই জাহাজ এ বন্দরে আছে, কেবল হিন্দুদের জাহাজ নেই।

চার-পাঁচ দিনে আমরা ইটালিতে গিয়ে পৌঁছলেম, তখন রাত্রি একটা-দুটো হবে। গরম বিছানা ত্যাগ করে, জিনিসপত্র নিয়ে আমরা জাহাজের ছাতে গিয়ে উঠলেম। জ্যোৎস্নারাত্রি, খুব শীত; আমার গায়ে বড়ো একটা গরম কাপড় ছিল না, তাই ভারি শীত করছিল। আমাদের সুমুখে নিস্তব্ধ শহর, বাড়িগুলির জানলা দরজা সমস্ত বন্ধ—সমস্ত নিদ্রামগ্ন। আমাদের যাত্রীদের মধ্যে ভারি গোল পড়ে গেল, কখনো শুনি ট্রেন পাওয়া যাবে, কখনো শুনি পাওয়া যাবে না। জিনিসপত্রগুলো নিয়ে কী করা যাবে ভেবে পাওয়া যায় না, জাহাজে থাকব কি বেরোব কিছুই স্থির নেই। একজন ইটালিয়ান অফিসার এসে আমাদের গুনতে আরম্ভ করলে—কিন্তু কেন গুনতে আরম্ভ করলে তা ভেবে পাওয়া গেল না। জাহাজের মধ্যে এইরকম একটা অস্ফুট জনশ্রুতি প্রচারিত হল যে, এই গণনার সঙ্গে আমাদের ট্রেনে চড়ার একটা বিশেষ যোগ আছ। কিন্তু সে-রাত্রে মূলেই ট্রেন পাওয়া গেল না। শোনা গেল,

তার পরদিন বেলা তিনটের আগে ট্রেন পাওয়া যাবে না। যাত্রীরা মহা বিরক্ত হয়ে উঠল। অবশেষে সে-রাত্রে ব্রিন্দিসির হোটেলে আশ্রয় নিতে হল।

এই তো প্রথম য়ুরোপের মাটিতে আমার পা পড়ল। কোনো নূতন দেশে আসবার আগে আমি তাকে এমন নূতনতর মনে করে রাখি যে, এসে আর তা নূতন বলে মনেই হয় না। য়ুরোপ আমার তেমন নূতন মনে হয় নি শুনে সকলেই অবাক। আমরা রাত্রি তিনটের সময় ব্রিন্দিসির হোটেলে গিয়ে শুয়ে পড়লেম। সকালে একটা আধমরা ঘোড়া ও আধভাঙা গাড়ি চড়ে শহর দেখতে বের হলেম। সারথির সঙ্গে গাড়িঘোড়ার এমন অসামঞ্জস্য যে কী বলব! সারথির বয়স চোদ্দো হবে–কিন্তু ঘোড়াটির বয়স পঞ্চাশ হবে–আর গাড়িটি পৌরাণিক যুগের মনে হল। ছোটোখাটো শহর যেমন হয়ে থাকে ব্রিন্দিসিও তাই। কতকগুলি কোঠাবাড়ি, দোকানবাজার, রাস্তাঘাট আছে। ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা করে ফিরছে, দু-চার জন লোক মদের দোকানে বসে গল্পগুজব করছে, দু-চার জন রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে হাসিতামাশা করছে; লোকজনেরা অতি নিশ্চিন্তমুখে গজেন্দ্রগমনে গমন করছে; যেন কারও কোনো কাজ নেই, কারও কোনো ভাবনা নেই–যেন শহরসুদ্ধ ছুটি। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার সমারোহ নেই, লোকজনের সমাগম নেই। আমরা খানিক দূর যেতেই এক জন ছোকরা আমাদের গাড়ি থামিয়ে হাতে একটা তরমুজ নিয়ে গাড়োয়ানের পাশে গিয়ে বসল। ব–মহাশয় বললেন, “বিনা আয়াসে এর কিছু রোজগার করবার বাসনা আছে।” লোকটা এসে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে মাঝে মাঝে আমাদের দেখিয়ে দিতে লাগল, “ঐটে চার্চ, ঐটে বাগান, ঐটে বাগন, ঐটে মাঠ” ইত্যাদি। তার টীকাতে আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞানবৃদ্ধি হয় নি, আর তারটীকা না হলেও আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞানের ব্যাঘাত হত না। তাকে কেউ আমাদের গাড়িতে উঠতে বলে নি, কেউ তাকে কোনো বিষয় জিজ্ঞাসাও করে নি, কিন্তু তবু এই অযাচিত অনুগ্রহের জন্য তার যাচঞা পূর্ণ করতে হল। তারা আমাদের একটা ফলের বাগানে নিয়ে গেল। সেখানে যে কত প্রকার ফলের গাছ, তার সংখ্যা নেই। চারিদিকে থোলো থোলো আঙুর ফলে রয়েছে। দু-রকম আঙুর আছে, কালো আর সাদা। তার মধ্যে কালোগুলিই আমার বেশি মিষ্টি লাগল। বড়ো বড়ো গাছে আপেল

পিচ প্রভৃতি অনেক প্রকার ফল ধরে আছে। একজন বুড়ি (বোধ হয় উদ্যানপালিকা) কতকগুলি ফলমূল নিয়ে উপস্থিত করলে। আমরা সেদিকে নজর করলেম না; কিন্তু ফল বিক্রয় করবার উপায় সে বিলক্ষণ জানে। আমরা ইতস্তত বেড়াচ্ছি, এমন সময়ে দেখি একটি সুন্দরী মেয়ে কতকগুলি ফল আর ফুলের তোড়া নিয়ে আমাদের সম্মুখে হাজির হল, তখন আর অগ্রাহ্য করবার সাধ্য রইল না।

ইটালির মেয়েদের বড়ো সুন্দর দেখতে। অনেকটা আমাদের দেশের মেয়ের ভাব আছে। সুন্দর রং, কালো কালো চুল, কালো ভুরু, কালো চোখ, আর মুখের গড়ন চমৎকার।

তিনটের ট্রেনে বৃন্দিসি ছাড়লেম। রেলোয়ে পথের দু-ধারে আঙুরের খেত, চমৎকার দেখতে। পর্বত, নদী, হ্রদ, কুটির, শস্যক্ষেত্র, ছোটো ছোটো গ্রাম প্রভৃতি। যত কিছু কবির স্বপ্নের ধন সমস্ত চারদিকে শোভা পাচ্ছে। গাছপালার মধ্যে থেকে যখন কোনো একটি দূরস্থ নগর, তার প্রাসাদচূড়া, তার চার্চের শিখর, তার ছবির মতো বাড়িগুলো আস্তে আস্তে চোখে পড়ে তখন বড়ো ভালো লাগে। সন্ধ্যেবেলায় একটি পাহাড়ের নিচে অতি সুন্দর একটি হ্রদ দেখেছিলেম, তা আর আমি ভুলতে পারব না, তার চারি দিকে গাছপালা, জলে সন্ধ্যার ছায়া সে অতি সুন্দর, তা আমি বর্ণনা করতে চাই নে।

রেলোয়ে করে যেতে যেতে আমরা Mont Cenis-এর বিখ্যাত সুরঙ্গ দেখলেম। এই পর্বতের এ-পাশ থেকে ফরাসিরা ও-পাশ থেকে ইটালিয়নরা, এক সঙ্গে খুদতে আরম্ভ করে, কয়েক বৎসর খুদতে খুদতে দুই যন্ত্রিদল ঠিক মাঝামাঝি এসে পরস্পরের সুমুখাসুমুখি হয়। এই গুহা অতিক্রম করতে রেলগাড়ির ঠিক আধ ঘণ্টা লাগল। সে অন্ধকারে আমরা যেন হাঁপিয়ে উঠছিলেম। এখানকার রেলগাড়ির মধ্যে দিনরাত আলো জ্বালাই আছে, কেন না এক-এক স্থানে প্রায় পাঁচ মিনিট অন্তর এক-একটা পর্বতগুহা ভেদ করতে হয়—সুতরাং দিনের আলো খুব অল্পক্ষণ পাওয়া যায়। ইটালি থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা—নির্ঝর নদী পর্বত গ্রাম হ্রদ দেখতে দেখতে আমরা পথের কষ্ট ভুলে গিয়েছিলেম।

সকালবেলায় প্যারিসে গিয়ে পৌঁছলেম। কী জমকালো শহর। অভ্রভেদী প্রাসাদের অরণ্যে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। মনে হয় প্যারিসে বুঝি গরীব লোক

নেই। মনে হল, এই সাড়ে তিন হাত মানুষের জন্যে এমন প্রকাণ্ড জমকালো বাড়িগুলোর কী আবশ্যক। হোটেলে গেলেম, এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যে, ঢিলে কাপড় পরে যেমন সোয়াস্তি হয় না, সে হোটেলেও বোধ করি তেমনি অসোয়াস্তি হয়। সমরণস্তম্ভ, উৎস, বাগান, প্রাসাদ, পাথরে বাঁধানো রাস্তা, গাড়ি, ঘোড়া, জনকোলাহল প্রভৃতিতে অবাক হয়ে যেতে হয়। প্যারিসে পৌঁছিয়েই আমরা একটা 'টার্কিশ-বাথে' গেলেম। প্রথমত একটা খুব গরম ঘরে গিয়ে বসলেম, সে-ঘরে অনেকক্ষণ থাকতে থাকতে কারো কারো ঘাম বেরতে লাগল, কিন্তু আমার তো বেরল না, আমাকে তার চেয়ে আর-একটা গরম ঘরে নিয়ে গেল, সে-ঘরটা আগুনের মতো, চোখ মেলে থাকলে চোখ জ্বালা করতে থাকে, মিনিট কতক থেকে সেখানে আর থাকতে পারলেম না, সেখান থেকে বেরিয়ে খুব ঘাম হতে লাগল। তার পরে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে আমাকে শুইয়ে দিলে। ভীমকায় এক ব্যক্তি এসে আমার সর্বাঙ্গ ডলতে লাগল। তার সর্বাঙ্গ খোলা, এমন মাংসপেশল চমৎকার শরীর কখনো দেখি নি। "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।" মনে মনে ভাবলেম ক্ষীণকায় এই মশকটিকে দলন করার জন্যে এমন প্রকাণ্ড কামানের কোনো আবশ্যক ছিল না। সে আমাকে দেখে বললে, আমার শরীর বেশ লম্বা আছে, এখন পাশের দিকে বাড়লে আমি একজন সুপুরুষের মধ্যে গণ্য হব;

আধ ঘণ্টা ধরে সে আমার সর্বাঙ্গ অবিশ্রান্ত দলন করলে, ভূমিষ্ঠকাল থেকে যত ধুলো মেখেছি, শরীর থেকে সব যেন উঠে গেল। যথেষ্টরূপে দলিত করে আমাকে আর-একটি ঘরে নিয়ে গেল, সেখানে গরম জল দিয়ে, সাবান দিয়ে, স্পঞ্জ দিয়ে শরীরটা বিলক্ষণ করে পরিষ্কার করলে। পরিষ্করণ-পর্ব শেষ হলে আর-একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে একটা বড়ো পিচকিরি করে গায়ে গরম জল ঢালতে লাগল, হঠাৎ গরম জল দেওয়া বন্ধ করে বরফের মতো ঠাণ্ডা জল বর্ষণ করতে লাগল; এইরকম কখনো গরম কখনো ঠাণ্ডা জলে স্নান করে একটা জলযন্ত্রের মধ্যে গেলেম, তার উপর থেকে নিচে থেকে চার পাশ থেকে বাণের মতো জল গায়ে বিঁধতে থাকে। সেই বরফের মতো ঠাণ্ডা বরুণ-বাণ-বর্ষণের মধ্যে খানিকক্ষণ থেকে আমার বুকের রক্ত পর্যন্ত যেন জমাট হয়ে গেল—রণে ভঙ্গ দিতে হল, হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এলেম। তার পরে এক জায়গায়

পুকুরের মতো আছে, আমি সাঁতার দিতে রাজি আছি কি না জিজ্ঞাসা করলে। আমি সাঁতার দিলেম না, আমার সঙ্গী সাঁতার দিলেন। তাঁর সাঁতার দেওয়া দেখে তারা বলাবলি করতে লাগল “দেখো, দেখো, এরা কী অদ্ভুত রকম করে সাঁতার দেয়, ঠিক কুকুরের মতো।” এতক্ষণে স্নান শেষ হল। আমি দেখলেম টার্কিশ-বাথে স্নান করা আর শরীটাকে ধোপার বাড়ি দেওয়া এক কথা। তার পরে সমস্ত দিনের জন্যে এক পাউণ্ড দিয়ে এক গাড়ি ভাড়া করা গেল। প্যারিস এক্সিবিশন দেখতে গেলেম। তুমি এইবার হয়তো খুব আগ্রহের সঙ্গে কান খাড়া করেছ, ভাবছ আমি প্যারিস এক্সিবিশনের বিষয় কী জানি বর্ণনা করব। কিন্তু দুঃখের বিষয় কী বলব, কলকাতার য়ুনিভার্সিটিতে বিদ্যা শেখার মতো প্যারিস এক্সিবিশনের সমস্ত দেখেছি কিন্তু কিছুই ভালো করে দেখি নি। একদিনের বেশি আমাদের প্যারিসে থাকা হল না—সে বৃহৎ কাণ্ড একদিনে দেখা কারও সাধ্য নয়। সমস্ত দিন আমরা দেখলেম-কিন্তু সে-রকম দেখায়, দেখবার একটা তৃষ্ণা জন্মাল কিন্তু দেখা হল না। সে একটা নগরবিশেষ। এক মাস থাকলে তবে তা বর্ণনা করবার দুরাশা করতেম। প্যারিস এক্সিবিশনের একটা স্তূপাকার ভাব মনে আছে, কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাব কিছুই মনে নেই। সাধারণত মনে আছে যে চিত্রশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য চমৎকার ছবি দেখেছি, স্থাপত্যশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য প্রস্তরমূর্তি দেখেছি, নানা দেশবিদেশের নানা জিনিস দেখেছি; কিন্তু বিশেষ কিছু মনে নেই। তার পর প্যারিস থেকে লণ্ডনে এলেম—এমন বিষণ্ন অন্ধকার-পুরী আর কখনো দেখি নি—ধোঁয়া, মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা, কাদা আর লোকজনের ব্যস্তসমস্ত ভাব। আমি দুই-এক ঘণ্টামাত্র লণ্ডনে ছিলেম, যখন লণ্ডন পরিত্যাগ করলেম তখন নিশ্বাস পরিত্যাগ করে বাঁচলেম। আমার বন্ধুরা আমাকে বললেন, লণ্ডনের সঙ্গে প্রথম দৃষ্টিতেই ভালোবাসা হয় না, কিছু দিন থেকে তাকে ভালো করে চিনলে তবে লণ্ডনের মাধুর্য বোঝা যায়।

য়ুরোপ-প্রবাসীর দ্বিতীয় পত্র

ইংলণ্ডে আসবার আগে আমি নির্বোধের মতো আশা করেছিলেম যে, এই ক্ষুদ্র দ্বীপের দুই হস্ত-পরিমিত ভূমির সর্বত্রই গ্ল্যাডস্টোনের বাগিমতা, ম্যাক্স্‌মুলরের বেদব্যখ্যা, টিণ্ড্যালের বিজ্ঞানতত্ত্ব, কার্লাইলের গভীর চিন্তা, বেনের দর্শশাস্ত্রে মুখরিত। সৌভাগ্যক্রমে তাতে আমি নিরাশ হয়েছি। মেয়েরা বেশভূষায় লিপ্ত, পুরুষেরা কাজকর্ম করছে, সংসার যেমন চলে থাকে তেমনি চলছে, কেবল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে কোলাহল শোনা যায়। মেয়েরা জিজ্ঞাসা করে থাকে, তুমি নাচে গিয়েছিলে কি না, কনসর্ট কেমন লাগল, থিয়েটারে একজন নূতন অ্যাক্টর এসেছে, কাল অমুক জায়গায় ব্যাণ্ড হবে ইত্যাদি। পুরুষেরা বলবে, আফগান যুদ্ধের বিষয় তুমি কী বিবেচনা কর, Marquis of Lorneকে লণ্ডনীয়েরা খুব সমাদর করেছিল, আজ দিন বেশ ভালো, কালকের দিন বড়ো মিজরেব্‌ল্‌ ছিল। এ দেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজায়, গান গায়, আগুনের ধারে আগুন পোয়ায়, সোফায় ঠেসান দিয়ে নভেল পড়ে, ভিজিটরদের সঙ্গে আলাপচারি করে ও আবশ্যক বা অনাবশ্যক মতে যুবকদের সঙ্গে ফ্লার্ট করে। এদেশের চির-আইবুড়ো মেয়েরা কাজের লোক। টেম্‌পারেন্স মীটিং, ওয়ার্কিং মেন্‌স্‌ সোসাইটি প্রভৃতি যতপ্রকার অনুষ্ঠানের কোলাহল আছে, সমুদয়ের মধ্যে তাদের কণ্ঠ আছে। পুরুষদের মতো তাঁদের আপিসে যেতে হয় না, মেয়েদের মতো ছেলেপিলে মানুষ করতে হয় না, এদিকে হয়তো এত বয়স হয়েছে যে 'বলে' গিয়ে নাচা বা ফ্লার্ট করে সময় কাটানো সংগত হয় না, তাই তাঁরা অনেক কাজ করতে পারেন, তাতে উপকারও হয়তো আছে।

এখানে দ্বারে দ্বারে মদের দোকান। আমি রাস্তায় বেরোলে জুতোর দোকান, দরজির দোকান, মাংসের দোকান, খেলনার দোকান পদে পদে দেখতে পাই কিন্তু বইয়ের দোকান প্রায় দেখতে পাই নে। আমাদের একটি কবিতার বই কেনবার আবশ্যক হয়েছিল, কিন্তু কাছাকাছির মধ্যে বইয়ের দোকান না দেখে একজন খেলনাওয়ালাকে সেই বই আনিয়ে দিতে হুকুম করতে হয়েছিল—আমি আগে

জানতেম, এ দেশে একটা কসাইয়ের দোকান যেমন প্রচুরূপে দরকারি, বইয়ের দোকানও তেমনি।

ইংলণ্ডে এলে সকলের চেয়ে চোখে পড়ে লোকের ব্যস্ততা। রাস্তা দিয়ে যারা চলে তাদের মুখ দেখতে মজা আছে—বগলে ছাতি নিয়ে হুস হুস করে চলেছে, পাশের লোকদের উপর ভ্রূক্ষেপ নেই, মুখে যেন মহা উদ্বেগ, সময় তাদের ফাঁকি দিয়ে না পালায় এই তাদের প্রাণপণ চেষ্টা। সমস্ত লণ্ডনময় রেলোয়ে। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর এক-একটা ট্রেন যাচ্ছে। লণ্ডন থেকে ব্রাইটনে আসবার সময় দেখি, প্রতি মুহূর্তে উপর দিয়ে একটা, নিচে দিয়ে একটা, পাশ দিয়ে একটা, এমন চারি দিক থেকে হুস হাস করে ট্রেন ছুটেছে। সে ট্রেনগুলোর চেহারা লণ্ডনের লোকদেরই মতো, এদিক থেকে ওদিক থেকে মহা ব্যস্তভাবে হাঁসফাঁস করতে করতে চলেছে। দেশ তো এই এক রত্তি, দু-পা চললেই ভয় হয় পাছে সমুদ্রে গিয়ে পড়ি, এখানে এত ট্রেন যে কেন ভেবে পাই নে। আমরা একবার লণ্ডনে যাবার সময় দৈবাৎ ট্রেন মিস করেছিলেম, কিন্তু তার জন্যে বাড়ি ফিরে আসতে হয় নি, তার আধ ঘণ্টা পরেই আর-এক ট্রেন এসে হাজির।

এ-দেশের লোক প্রকৃতির আদুরে ছেলে নয়, কারুর নাকে তেল দিয়ে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে থাকবার জো নেই। একে তো আমাদের দেশের মতো এ-দেশের জমিতে আঁচড় কাটলেই শস্য হয় না, তাতে শীতের সঙ্গে মারামারি করতে হয়। তা ছাড়া শীতের উপদ্রবে এদের কত কাপড় দরকার হয় তার ঠিক নেই—তার পরে কম খেলে এ-দেশে বাঁচবার জো নেই; শরীরে তাপ জন্মাবার জন্যে অনেক খাওয়া চাই। এ-দেশের লোকের কাপড়, কয়লা, খাওয়া অপর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকলে চলে না, তার উপরে আবার মদ আছে। আমাদের বাংলার খাওয়া নামমাত্র, কাপড় পরাও তাই। এ-দেশে যার ক্ষমতা আছে সেই মাথা তুলতে পারে, দুর্বল লোকদের এখানে রক্ষা নেই—একে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ তাতে কার্যক্ষেত্রে সহস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা রোখারুখি করছে।

ক্রমে ক্রমে এখানকার দুই-এক জন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হতে চলল। একটা মজা দেখছি, এখানকার লোকেরা আমাকে নিতান্ত অবুঝের মতো

মনে করে। একদিন Dr—এর ভাইয়ের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়েছিলেম। একটা দোকানের সম্মুখে কতকগুলো ফটোগ্রাফ ছিল, সে আমাকে সেইখানে নিয়ে গিয়ে ফটোগ্রাফের ব্যাখ্যান আরম্ভ করে দিলে—আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে, একরকম যন্ত্র দিয়ে ঐ ছবিগুলো তৈরি হয়, মানুষে হাতে করে আঁকে না। আমার চার দিকে লোক দাঁড়িয়ে গেল। একটা ঘড়ির দোকানের সামনে নিয়ে, ঘড়িটা যে খুব আশ্চর্য যন্ত্র তাই আমার মনে সংস্কার জন্মাবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল। একটা ঈভনিং পার্টিতে মিস—আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি এর পূর্বে পিয়ানোর শব্দ শুনেছি কি না। এ-দেশের অনেক লোক হয়তো পরলোকের একটা ম্যাপ এঁকে দিতে পারে কিন্তু ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যদি একবিন্দুও খবর জানে। ইংলণ্ড থেকে কোনো দেশের যে কিছু তফাত আছে তা তারা কল্পনাও করতে পারে না। ভারতবর্ষের কথা দূরে থাক্—সাধারণ লোকেরা কত বিষয় জানে না তার ঠিক নেই।

য়ুরোপ-প্রবাসীর তৃতীয় পত্র

আমরা সেদিন ফ্যান্সি-বলে অর্থাৎ ছদ্মবেশী নাচে গিয়েছিলেম—কত মেয়ে পুরুষ নানারকম সেজেগুজে সেখানে নাচতে গিয়েছিল। প্রকাণ্ড ঘর, গ্যাসের আলোয় আলোকাকীর্ণ, চার দিকে ব্যাণ্ড বাজছে—ছ-সাত-শ সুন্দরী, সুপুরষ। ঘরে ন স্থানং তিল ধারয়েৎ—চাঁদের হাট তো তাকেই বলে। এক-একটা ঘরে দলে দলে স্ত্রী পুরুষে হাত ধরাধরি করে ঘুরে ঘুরে নাচ আরম্ভ করেছে, যেন জোড়া জোড়া পাগলের মতো। এক-একটা ঘরে এমন সত্তর-আশি জন যুগলমূর্তি, এমন ঘোঁষাঘেঁষি যে, কে কার ঘাড়ে পড়ে তার ঠিক নেই। একটা ঘরে শ্যাম্পেনের কুরুক্ষেত্র পড়ে গিয়েছে, মদ্যমাংসের ছড়াছড়ি, সেখানে লোকারণ্য; এক-একটা মেয়ের নাচের বিরাম নেই, দু-তিন ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত তার পা চলছে। এক জন মেম তুষার-কুমারী সেজে গিয়েছিলেন, তার সমস্তই শুভ্র, সর্বাঙ্গে পুঁতির সজ্জা, আলোতে ঝকমক করছে। এক জন মুসলমানিনী সেজেছিলেন; একটা লাল ফুলো ইজের, উপরে একটা রেশমের পেশোয়াজ, মাথায় টুপির মতো—এ কাপড়ে তাঁকে বেশ মানিয়ে গিয়েছিল—এক জন সেজেছিলেন আমাদের দিশি মেয়ে, একটা শাড়ি আর একটা কাঁচুলি তাঁর প্রধান সজ্জা, তার উপরে একটা চাদর, তাতে ইংরেজি কাপড়ের চেয়ে তাঁকে ঢের ভালো দেখাচ্ছিল। একজন সেজেছিলেন বিলিতি দাসী। আমি বাংলার জমিদার সেজেছিলেম, জরি দেওয়া মখমলের কাপড়, জরি দেওয়া মখমলের পাগড়ি প্রভৃতি পরেছিলেম। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ অযোধ্যার তালুকদার সেজে গিয়েছিলেন, সাদা রেশমের ইজের খচিত, সাদা রেশমের চাপকান, সাদা রেশমের জোব্বা, জরিতে ঝকমকায়মান পাগড়ি, জরির কোমরবন্ধ-তাঁর সজ্জা। অযোধ্যার তালুকদারেরা যে এই রকম কাপড় পরে তা হয়তো নয়, কিন্তু ধরা পড়বার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আফগান সেনাপতি সেজেছিলেন।

গত মঙ্গলবারে আমরা এক ভদ্রলোকের বাড়িতে নাচের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেম। সন্ধ্যেবেলায় কোথাও নিমন্ত্রণে যেতে হলে শীতের জন্য সচরাচর মোটা কাপড় পরতে হয়, কিন্তু ঈভনিং পার্টি প্রভৃতিতে পাতলা কালো বনাতের

কাপড় পরাই রীতি। সান্ধ্য পরিচ্ছদের কামিজটি একেবারে নিষ্কলঙ্ক ধবধবে সাদা হওয়া চাই, তার উপরে প্রায় সমস্ত-বুক খোলা এক বনাতের ওয়েস্টকোট, কালো ওয়েস্টকোটের মধ্যে সাদা কামিজের সুমুখ দিকটা বেরিয়ে থাকে, গলায় সাদা ফিতে (নেকটাই) বাঁধা, সকলের উপর একটি টেল-কোট (লাঙুল-কোট); টেলকোটের সুমুখ দিকটা কোমর পর্যন্ত কাটা, আমাদের চাপকান প্রভৃতি পোষাকগুলি যেমন হাঁটু পর্যন্ত পেড়, এ তা নয়। এর সুমুখ দিকটার সীমা কোমর পর্যন্ত, কিন্তু পিছন দিকটা কাটা নয়, সুতরাং কতকটা লেজের মতো ঝুলতে থাকে। ইংরেজদের হনুকরণে এই লেজকোট পরতে হল। নাচ-পার্টিতে যেতে হলে হাতে একজোড়া সাদা দস্তানা পরা চাই, কারণ যে মহিলাদের হাতে হাত দিয়ে নাচতে হবে, খালি হাত লেগে তাঁদের হাত ময়লা হয়ে যেতে পারে কিংবা তাঁদের হাতে যদি দস্তানা থাকে সেটা ময়লা হবার ভয় আছে। অন্য কোনো জায়গায় লেডিদের সঙ্গে শেক্‌হ্যাণ্ড করতে গেলে হাতের দস্তানা খুলে ফেলতে হয়, কিন্তু নাচের ঘরে তার উল্‌টো।

যা হক, আমরা তো সাড়ে নটার সময় তাঁদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেম। তখনো নাচ আরম্ভ হয় নি। ঘরের দুয়ারের কাছে গৃহকর্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি বিশেষ পরিচিতদের সঙ্গে শেক্‌হ্যাণ্ড করছেন, অপরিচিতদের প্রতি শিরঃকম্পন ও সকলকে অভ্যর্থনা করছেন। এ গোরাদের দেশে নিমন্ত্রণসভা গৃহকর্তার বড়ো উঁচু পদ নেই, তিন সভায় উপস্থিত থাকুন বা শয়নগৃহে নিদ্রা দিন, তাতে কারও বড়ো কিছু এসে যায় না। আমরা ঘরে প্রবেশ করলেম, গ্যাসের আলোয় ঘর উজ্জ্বল, শত শত রমণীর রূপের আলোকে গ্যাসের আলো ম্রিয়মান; রূপের উৎসব পড়ে গিয়েছে, ঘরের ভিতরে প্রবেশ করবামাত্রই চোখে ধাঁধা লেগে যায়। ঘরের একপাশে পিয়ানো, বেহালা, বাঁশি বাজছে, ঘরের চারিধারে কৌচ চৌকি সাজানো, ইতস্তত দেয়ালের আয়নার উপর গ্যাসের আলো ও রূপের প্রতিবিম্ব পড়ে ঝকমক করছে। নাচবার ঘরের মেজে কাঠের, তার উপর কার্পেট প্রভৃতি কিছু পাতা নেই সে কাঠের মেজে এমন পালিশ করা যে, পা পিছলে যায়। ঘর যত পিছল হয় ততই নাচবার উপযুক্ত হয়, কেননা পিছল ঘরে নাচের গতি সহজে হয়, পা কোনো বাধা পায় না, আপনা-আপনি পিছলে আসে। ঘরের চারিদিকে আশেপাশে যে-সকল

বারান্দার মতো আছে, তাই একটু ঢেকেঢুকে, গাছপালা দিয়ে, দু-একটি কৌচ চৌকি রেখে তাকে প্রণয়ীদের কুঞ্জ নামে অভিহিত করা হয়েছে। সেইখানে নাচে শ্রান্ত হয়ে বা কোলাহলে বিরক্ত হয়ে যুবকযুবতী নিরিবিলি মধুরালাপ মগ্ন থাকতে পারেন। ঘরে ঢোকবার সময় সকলের হাতে সোনার অক্ষরে ছাপ এক-একখানি কাগজ দেওয়া হয়, সেই কাগজে কী কী নাচ হবে তাই লেখা থাকে। ইংরেজি নাচ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, একরকম হচ্ছে স্ত্রীপুরুষে মিলে ঘুরে ঘুরে নাচা, তাতে কেবল দু-জন লোক একসঙ্গে নাচে; আর-একরকম নাচে চারটি জুড়ি নর্তকনর্তকী চতুষ্কোণ হয়ে সুমুখাসুমুখি দাঁড়ায় ও হাতধরাধরি করে নানা ভঙ্গীতে চলাফেরা করে বেড়ায়, কোনো কোনো সময় চার জুড়ি না হয়ে আট জুড়িও হয়। ঘুরে ঘুরে নাচকে রাউণ্ড ডান্স্ বলে ও চলাফেরা করে নাচার নাম স্কোয়ার ডান্স। নাচ আরম্ভ হবার পূর্বে গৃহকর্ত্রী মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে আলাপ করিয়ে দেন অর্থাৎ পুরুষ-অভ্যাগতকে সঙ্গে করে কোনো এক অভ্যাগত-মহিলার কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন, “মিস অমুক, ইনি মিস্টার অমুক।” অমনি মিস ও মিস্টার শিরঃকম্পন করেন। কোনো মিসের সঙ্গে পরিচয় হবার পর নাচবার ইচ্ছে করলে পকেট থেকে সেই সোনার জলে ছাপানো প্রোগ্রামটি বের করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে হয়, “আপনি কি অমুক নৃত্যে বাগদত্তা হয়ে আছেন?” তিনি যদি ‘না’ বলেন তা হলে তাঁকে বলতে হবে, “তবে আমি কি আপনার সঙ্গে নাচবার সুখভোগ করতে পারি?” তিনি ‘থ্যাঙ্ক য়ু’ বললে বোঝা যাবে কপালে তাঁর সঙ্গে নাচবার সুখ আছে। অমনি সেই কাগজটিতে সেই নাচের পাশে তাঁর নাম এবং তাঁর কাগজে আবেদনকারীর নাম লিখে দিতে হয়।

নাচ আরম্ভ হল। ঘুর-ঘুর-ঘুর। একটা ঘরে, মনে করো, চল্লিশ-পঞ্চাশ জুড়ি নাচছে; ঘেঁষাঘেঁষি, ঠেলাঠেলি, কখনো বা জুড়িতে জুড়িতে ধাক্কাধাক্কি। তবু ঘুর-ঘুর-ঘুর। তালে তালে বাজনা বাজছে, তালে তালে পা পড়ছে, ঘর গরম হয়ে উঠেছে। একটা নাচ শেষ হল, বাজনা থেমে গেল; নর্তক মহাশয় তাঁর শ্রান্ত সহচরীকে আহারের ঘরে নিয়ে গেলেন, সেখানে টেবিলের উপর ফলমূল মিষ্টান্ন মদিরার আয়োজন; হয়তো আহার-পান করলেন না-হয় দুজনে নিভৃত কুঞ্জে বসে

রহস্যালাপ করতে লাগলেন। আমি নতুন লোকের সঙ্গে বড়ো মিলে মিশে নিতে পারি নে, যে-নাচে আমি একেবারে সুপণ্ডিত, সে-নাচও নতুন লোকের সঙ্গে নাচতে পারি নে। সত্যি কথা বলতে কি, নাচের নেমন্তন্নগুলো আমার বড়ো ভালো লাগে না। যাদের সঙ্গে বিশেষ আলাপ আছে, তাদের সঙ্গে নাচতে মন্দ লাগে না। যেমন তাস খেলবার সময় খারাপ জুড়ি পেলে তার ‘পরে তার দলের লোক চটে যায়, তেমনি নাচের সময় খারাপ জুড়ির ‘পরে মেয়েরা ভারি চটে যায়। আমার নাচের সহচরী বোধ হয় নাচার সময় মনে মনে আমার মরণ কামনা করেছিলেন। নাচ ফুরিয়ে গেল, আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম, তিনিও নিস্তার পেলেন।

প্রথমে নাচের ঘরে ঢুকেই আমি একেবারে চমকে উঠেছিলেম, দেখি যে শত শ্বেতাঙ্গিনীদের মধ্যে আমাদের একটি ভারতবর্ষীয়া শ্যামাঙ্গিনী রয়েছেন। দেখেই তো আমার বুকটা একেবারে নেচে উঠেছিল। তার সঙ্গে কোনোমতে আলাপ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেম। কতদিন শ্যামলা মুখ দেখি নি! আর, তার মুখে আমাদের বাঙালি মেয়েদের ভালোমানুষি নম্রভাব মাখানো। আমি অনেক ইংরেজ মেয়েদের মুখে ভালোমানুষি নরম ভাব দেখেছি কিন্তু এর সঙ্গে তার কী একটা তফাত আছে বলতে পারি নে। তার চুল বাঁধা আমাদের দেশের মতো। সাদা মুখ আর উগ্র অসংকোচ সৌন্দর্য দেখে দেখে আমার মনটা ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল, এতদিন তাই বুঝতে পারলেম। হাজার হক, ইংরেজ মেয়েরা সম্পূর্ণ আলাদা জাত, আমি এতদূর ইংরেজি কায়দ শিখি নি যে, তাদের সঙ্গে বেশ খোলাখুলিভাবে কথাবার্তা কইতে পারি। পরিচিত বাঁধি গতের সীমা লঙ্ঘন করতে সাহস হয় না।

আজ ব্রাইটনের অনেক তপস্যার ফলে সূর্য উঠেছেন। এদেশে রবি যেদিন মেঘের অন্তঃপুর থেকে বের হন সেদিন একটি লোকও কেউ ঘরে থাকে না। সেদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াবার রাস্তায় লোক কিলবিল করতে থাকে। এদেশে যদিও ‘বাড়ির ভিতর’ নেই, তবু এদেশের মেয়েরা যেমন অসূর্যম্পশ্যরূপা এমন আমাদের দেশে নয়।

সাড়ে আটটার কমে আমাদের বিছানা থেকে ওঠা হয় না, ছ-টার সময় বিছানা থেকে উঠলে এখানকার লোকেরা আশ্চর্য হয়। তার পরে উঠেই আমি রোজ ঠাণ্ডা জলে স্নান করি। এদেশে যাকে স্নান বলে, আমি সে-রকম সনানের বিড়ম্বনা করি

নে। আমি মাথায় জল ঢেলে স্নান করি, গরম জল নয়—এখানকার এই বরফের মতো ঠাণ্ডা জল। ন-টার সময় আমাদের খাবার আসে। এখানকার ন-টা আর সেখানকার ছ-টা সমান। আমাদের আর-একটি খাওয়া দেড়টার সময়, সেইটিই প্রধান খাওয়া—মধ্যাহ্নভোজন। মধ্যে একবার চা রুটি প্রভৃতি আসে, তার পরে রাত আটটার সময় আর-একটি সুপ্রশস্ত ভোজনের আয়াজন হয়ে থাকে; এইরকম আমাদের দিনের প্রধান বিভাগগুলি খাওয়া নিয়ে।

অন্ধকার হয়ে আসছে, চারটে বাজে বলে, চারটে বাজলে পরে আলো না জ্বেলে পড়া পুষ্কর। এখানে প্রকৃতপক্ষে ন-টার সময় দিন আরম্ভ হয়, কেননা গড়ে রোজ আটটার কমে ওঠা হয় না। তার পর আবার বৈকাল চারটের সময়েই এখানকার দিনের আলো নিভে যায়। দিনগুলো যেন দশটা চারটে আপিস করতে আসে। ট্যাঁক-ঘড়ির ডালা খুলতে খুলতেই এদেশে দিন চলে যায়। এখানকার রাত্তির তেমনি ঘোড়ায় চড়ে আসে, আর পায় হেঁটে ফেরে।

মেঘ, বৃষ্টি, বাদল, অন্ধকার, শীত—এ আর একদণ্ডের তরে ছাড়া নেই। আমাদের দেশে যখন বৃষ্টি হয়, তখন মুষলধারে বৃষ্টির শব্দ, মেঘ, বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়—তাতে একটা কেমন উল্লাসের ভাব আছে; এখানে এ তা নয়, এ টিপ টিপ করে সেই একঘেয়ে বৃষ্টি ক্রমাগতই অতিনিঃশব্দ পদসঞ্চারে চলছে তো চলছেই। রাস্তায় সাদা, পত্রহীন গাছগুলো স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে, কাঁচের জানলার উপর টিপ টিপ করে জল ছিটিয়ে পড়ছে। আমাদের দেশে স্তরে স্তরে মেঘ করে; এখানে আকাশ সমতল, মনে হয় না যে মেঘ করেছে, মনে হয় কোনো কারণে আকাশের রংটা ঘুলিয়ে গিয়েছে, সমস্তটা জড়িয়ে স্থাবরজঙ্গমের একটা অবসন্ন মুখশ্রী। লোকের মুখে সময়ে সময়ে শুনতে পাই বটে যে, কাল বজ্র ডেকেছিল, কিন্তু বজ্রের নিজের এমন গলার জোর নেই যে তার মুখ থেকেই সে খবরটা পাই। সূর্য তো এখানে গুজবের মধ্যে হয়ে পড়েছে। যদি অনেক ভাগ্যবলে সকালে উঠে সূর্যের মুখ দেখতে পাই, তবে তখনই আবার মনে হয়—

এমন দিন না রবে, তা জানো।

দিনে দিনে শীত খুব ঘনিয়ে আসছে; লোকে বলছে, কাল পরশুর মধ্যে হয়তো আমরা বরফ পড়া দেখতে পাব। তাপমান যন্ত্র ত্রিশ ডিগ্রি পর্যন্ত নেবে গিয়েছে—সেই তো হচ্ছে ফ্রীজিং পয়েন্ট। অল্পস্বল্প ফ্রস্ট দেখা দিয়েছে। রাস্তার মাটি খুব

শক্ত। কেননা তার মধ্যে যা জল ছিল সমস্ত জমাট হয়ে গিয়েছে। রাস্তার মাঝে মাঝে কাঁচের টুকরোর মতো শিশির খুব শক্ত হয়ে জমেছে। দুই-এক জায়গায় ঘাসের মধ্যে কে যেন চুন ছড়িয়ে দিয়েছে, বরফের এই প্রথম সূত্রপাত। খবু শীত পড়েছে, এক এক সময়ে হাত-পা এমন ঠাণ্ডা হয়ে যায় যে জ্বালা করতে থাকে। সকালে লেপ থেকে বেরোতে ভাবনা হয়।

আমাদের দিশি কাপড় দেখে রাস্তার এক-এক জন সত্যি সত্যি হেসে ওঠে, এক-এক জন এত আশ্চর্য হয়ে যায় যে, তাদের আর হাসবার ক্ষমতা থাকে না। কত লোক হয়তো আমাদের জন্য গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছে। প্যারিসে আমাদের গাড়ির পিছনে পিছনে এক দল ইস্কুলের ছোকরা চীৎকার করতে করতে ছুটেছিল, আমরা তাদের সেলাম করলেম। এক-এক জন আমাদের মুখের উপর হেসে ওঠে, এক-এক জন চেঁচাতে থাকে–"Jack look at the blackies! "

য়ুরোপ-প্রবাসীর চতুর্থ পত্র

আমরা সেদিন হাউস অফ কমন্সে গিয়েছিলেম। পার্লামেন্টের অভ্রভেদী চূড়া, প্রকাণ্ড বাড়ি, হাঁ-করা ঘরগুলো দেখলে তাক লেগে যায়। একটা বড়ো ঘরে হাউস বসে, ঘরের চারি দিকে গোল গ্যালারি, তার এক দিকে দর্শকেরা আর-এক দিকে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা। গ্যালারি অনেকটা থিয়েটারের ড্রেস-সার্কলের মতো। গ্যালারির নিচে স্টল মেম্বাররা বসে। তাদের জন্যে দু-পাশে হদ্দ দশখানি বেঞ্চি। এক পাশের পাঁচখানি বেঞ্চিতে গবর্নমেন্টের দল, আর-এক পাশের পাঁচখানিতে বিপক্ষ দল। সুমুখের প্লাটফর্মের উপর একটা কেদারা আছে, সেইখানে প্রেসিডেন্টের মতো এক জন (যাকে স্পীকার বলে) মাথার পরচুলা পরে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বসে থাকেন। যদি কেউ কখনো কখনো অন্যায় ব্যবহার বা কোনো আইনবিরুদ্ধ কাজ করে তাহলে স্পীকার উঠে তাকে বাধা দেয়। যেখানে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা সব বসে, তার পিছনে খড়খড়ি-দেওয়া একটা গ্যালারিতে মেয়েদের জায়গা, বাইরে থেকে তাদের দেখা যায় না। আমরা যখন গেলেম, তখন ওড্ডোনে বলে এক জন আইরিশ সভ্য ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, প্রেস-অ্যাক্টের বিরুদ্ধে ও অন্যান্য নানা বিষয় নিয়ে তিনি আন্দোলন করছিলেন। তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেল। হাউসের ভাবগতিক দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেম। যখন এক জন কেউ বক্তৃতা করছে, তখন হয়তো অনেক মেম্বার মিলে "ইয়া" "ইয়া" "ইয়া" "ইয়া" করে চীৎকার করছে, হাসছে। আমাদের দেশে সভাস্থলে ইস্কুলের ছোকরারাও হয়তো এমন করে না। অনেক সময়ে বক্তৃতা হচ্ছে আর মেম্বাররা কপালের উপর টুপি টেনে দিয়ে অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছেন। এক বার দেখলেম যে, ভারতবর্ষের বিষয় নিয়ে একটা বক্ততার সময় ঘরে নয়-দশ জনের বেশি মেম্বার ছিল না, অন্যান্য সবাই ঘরের বাইরে হাওয়া খেতে, বা সাপার খেতে গিয়েছেন; আর যেই ভোট নেবার সময় হল

অমনি সবাই চারদিক থেকে এসে উপস্থিত। বক্তৃতা শুনে বা কোনাপ্রকার যুক্তি শুনে যে কারো মত স্থির হয়, তা তো বোধ হল না।

গত বৃহস্পতিবারে হাউস অফ কমন্সে ভারতবর্ষ নিয়ে খুব বাদানুবাদ চলেছিল। সেদিন ব্রাইট সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে, গ্লাডস্টোন তুলা-জাতের শুল্ক ও আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয়দের দরখাস্ত দাখিল করেন। চারটের সময় পার্লামেন্ট খোলে। আমরা কয়েক জন বাঙালি চারটে না বাজতেই হাউসে গিয়ে উপস্থিত হলেম। তখন হাউস খোলে নি, দর্শনার্থীরা হাউসের বাইরে একটা প্রকাণ্ড ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের চার দিকে বার্ক, ফক্স, চ্যাটাম, ওঅলপোল প্রভৃতি রাজনীতিবিশারদ মহাপুরুষদের প্রস্তরমূর্তি। প্রতি দরজার কাছে পাহারাওআলা পাকা চুলের পরচুলা-পরা। গাউন-ঝোলানো পার্লামেন্টের কর্মচারীরা হাতে দুই একটা খাতাপত্র নিয়ে আনাগোনা করছিলেন। চারটের সময় হাউস খুলল। আমাদের কাছে স্পীকার্স গ্যালারির টিকিট ছিল। হাউস অফ কমন্সে পাঁচ শ্রেণীর গ্যালারি আছে, –স্ট্রেঞ্জার্স গ্যালারি, স্পীকার্স গ্যালারি, ডিপ্লম্যাটিক গ্যালারি, রিপোর্টার্স গ্যালারি, লেডিজ গ্যালারি। হাউসের যে-কোনো মেম্বারের কাছ থেকে বৈদেশিক গ্যালারির টিকিট পাওয়া যায়, আর বক্তার অনুগ্রহ হলে তবে বক্তার গ্যালারির টিকিট পাওয়া যেতে পারে। ডিপ্লমাটিক গ্যালারিটা কী পদার্থ তা ভালো করে বলতে পারি নে, আমি যে ক-বার হাউসে গিয়েছি দুই-এক জন ছাড়া সেখানে লোক দেখতে পাই নি। স্ট্রেঞ্জার্স গ্যালারি থেকে বড়ো ভালো দেখাশুনো যায় না; তার সামনে স্পীকার্স গ্যালারি; তার সামনে ডিপ্লম্যাটিক গ্যালারি। আমরা গিয়ে তো বসলেম। পরচুলাধারী স্পীকার মহাশয় গরুড় পক্ষীটির মতো তাঁর সিংহাসনে উঠলেন। হাউসের সভ্যেরা সব আসন গ্রহণ করলেন। কাজ আরম্ভ হল। হাউসের প্রথম কাজ প্রশ্নোত্তরকরা। হাউসের পূর্ব অধিবেশনে এক-এক জন মেম্বার বলে রাখেন যে, “আগামী বারে আমি অমুক অমুক বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, তার উত্তর দিতে হবে।” সেদিন ওজ্ডোনেল নামে একজন আইরিশ মেম্বার

জিজ্ঞাসা করলেন যে, “একো এবং আরো দুই-একটি খবরের কাগজে জুলুদের প্রতি ইংরেজ সৈন্যদের অত্যাচারের যে বিবরণ বেরিয়েছে, সে বিষয়ে গবর্নমেন্ট কি কোনো সংবাদ পেয়েছেন? আর যেসেকল অত্যাচার কি খ্রীষ্টানদের অনুচিত নয়?” অমনি গবর্নমেন্টের দিক থেকে সার মাইকেল হিক্‌স্‌বিচ উঠে ওজ্ডোনেলকে কড়া কড়া দুই-এক কথা শুনিয়ে দিলেন, অমনি একে একে যত আইরিশ মেম্বার ছিলেন, সকলে উঠে তার কড়া কড়া উত্তর দিতে লাগলেন। এইরকম অনেকক্ষণ ঝগড়াঝাঁটি করে দুই পক্ষ শান্ত হয়ে বসলেন। উত্তর-প্রত্যুত্তরের ব্যাপার সমাপ্ত হলে পর যখন বক্তৃতা করবার সময় এল, তখন হাউস থেকে অধিকাংশ মেম্বার উঠে চলে গেলেন। দুই-একটা বক্তৃতার পর ব্রাইট উঠে সিভিল সার্ভিসের রাশি রাশি দরখাস্ত হাউসে দাখিল করলেন। বৃদ্ধ ব্রাইটকে দেখলে অত্যন্ত ভক্তি হয়, তাঁর মুখে ঔদার্য ও দয়া যেন মাখানো। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রাইট সেদিন কিছু বক্তৃতা করলেন না। হাউসে অতি অল্প মেম্বারই অবশিষ্ট ছিলেন, যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিদ্রার আয়োজন করছিলেন, এমন সময় গ্লাডস্টোন উঠলেন। গ্ল্যাডস্টোন ওঠবামাত্র সমস্ত ঘর একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল, গ্ল্যাডস্টোনের স্বর শুনতে পেয়ে আস্তে আস্তে বাইরে থেকে দলে দলে মেম্বার আসতে লাগলেন, দুই দিকের বেঞ্চি পুরে গেল। তখন পূর্ণ উৎসের মতো গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতা উৎসারিত হতে লাগল। কিছুমাত্র চীৎকার, তর্জনগর্জন ছিল না, অথচ তাঁর প্রতি কথা, ঘরের যেখানে যে-কোনো লোক বসেছিল, সকলেই একেবারে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। গ্ল্যাডস্টোনের কী একরকম দৃঢ়স্বরে বলবার ধরন আছে, তাঁর প্রতি কথা মনের ভিতর গিয়ে যেন জোর করে বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়। একটা কথায় জোর দেবার সময় তিনি মুষ্টি বদ্ধ করে একেবারে নুয়ে নুয়ে পড়েন। যেন প্রত্যেক কথা তিনি একেবারে নিংড়ে নিংড়ে বের করছেন। আর সেইরকম প্রতি জোর-দেওয়া কথা দরজা ভেঙে চুরে যেন মনের ভিতর প্রবেশ করে। গ্ল্যাডস্টোন অনর্গল বলেন বটে কিন্তু তাঁর প্রতি কথা ওজন করা, তার

কোনো অংশ অসম্পূর্ণ নয়; তিনি বক্তৃতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্বরে জোর দিয়ে বললেন না, কেননা সে-রকম বলপূর্বক বললে স্বাভাবতই শ্রোতাদের মন তার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়ায়। তিনি যে-কথায় জোর দেওয়া আবশ্যক মনে করেন, সেই কথাতেই জোর দেন; তিনি খুব তেজের সঙ্গে বলেন বটে, কিন্তু চীৎকার করে বলেন না, মনে হয় যা বলছেন, তাতে তাঁর নিজের খুব আন্তরিক বিশ্বাস।

গ্লাডস্টোনের বক্তৃতাও যেমন থামল, অমনি হাউস শূন্যপ্রায় হয়ে গেল, দু-দিকের বেঞ্চিতে ছ-সাত জনের বেশি আর লোক ছিল না। গ্ল্যাডস্টোনের পর সমলেট যখন বক্তৃতা আরম্ভ করলেন তখন দুই দিককার বেঞ্চিতে লোক ছিল না বললেও হয়; কিন্তু তিনি ক্ষান্ত হবার পাত্র নন, শূন্য হাউসকে সম্বোধন করে অত্যন্ত দীর্ঘ এক বক্তৃতা করলেন। সেই অবকাশে আমি অত্যন্ত দীর্ঘ এক নিদ্রা দিই। দুই-এক জন মেম্বার, যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা কেউ বা পরস্পর গল্প করছিলেন, কেউ বা চোখের উপর টুপি টেনে দিয়ে ডিসরেলির পদচ্যুতির পর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছিলেন। হাউসে আইরিশ মেম্বারদের ভারি মুশকিল; তাঁরা যখন বক্তৃতা করতে ওঠেন, তখন চার দিক থেকে ঘোরতর কোলাহল আরম্ভ হয়, মেম্বারেরা হাঁসের মতো "ইয়া" "ইয়া" করে চেঁচাতে থাকে। বিদ্রূপাত্মক "হিয়ার" "হিয়ার" শব্দে বক্তার স্বর ডুবে যায়। এইরকম বাধা পেয়ে বক্তা আর আত্মসংবরণ করতে পারেন না, খুব জ্বলে ওঠেন, আর তিনি যতই রাগ করতে থাকেন ততই হাস্যাস্পদ হন। আইরিশ মেম্বারেরা এই রকম জ্বালাতন হয়ে আজকাল শোধ তুলতে আরম্ভ করেনে। হাউসে যে-কোনো কথা ওঠে, প্রায় সকল বিষয়েই তাঁরা বাধা দেন, আর প্রতি প্রস্তাবে এক জনের পর আর-এক জন করে উঠে দীর্ঘকালব্যাপী বক্তৃতায় হাউসকে বিব্রত করে তোলেন।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পঞ্চম পত্র

বিলেতে নতুন এসেই বাঙালিদের চোখে কোন্ জিনিস ঠেকে, বিলিতি সমাজে নতুন মিশে প্রথমে বাঙালিদের কী রকম লাগে, সে-সকল বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আপাতত কিছু বলব না। কেননা, এ-সকল বিষয় আমার বিচার করবার অধিকার নেই, যাঁরা পূর্বে অনেক কাল বিলেতে ছিলেন ও বিলেত যাঁরা খুব ভালো করে চেনেন তাঁরা আমাকে সঙ্গে করে এনেছেন, আর তাঁদের সঙ্গেই আমি বাস করছি। বিলেতের আসবার আগেই বিলেতের বিষয় তাঁদের কাছে অনেক শুনতে পেতেম, সুতরাং এখানে এসে খুব অল্প জিনিস নিতান্ত নতুন মনে হয়েছে। এখানকার লোকের সঙ্গে মিশতে গিয়ে প্রতি পদে হুঁচট খেয়ে খেয়ে আচার-ব্যবহার আমাকে শিখতে হয়নি। তাই ভাবছি যে, আমার নিজের অভিজ্ঞতার বিষয় আপাতত তোমাদের কিছু বলব না। এখানকার দুই-এক জন বাঙালির মুখে তাঁদের যে-রকম বিবরণ শুনেছি তাই তোমাদের লিখছি।

জাহাজে তো তাঁরা উঠলেন। যাত্রীদের সেবার জন্যে জাহাজে অনেক ইংরেজ চাকর থাকে, তাদের নিয়েই প্রথম গোল বাধে। এঁরা অনেকে তাদের "সার" "সার" বলে সম্বোধন করতেন, তাদের কোনো কাজ করতে হুকুম দিতে তাঁদের বাধো-বাধো করত। জাহাজে তাঁরা অত্যন্ত সসংকোচ ভাবে থাকতেন। তাঁরা বলেন, সকল বিষয়েই তাঁদের যে ও-রকম সংকোচ বোধ হত, সেটা কেবল ভয়ে নয়, তার সঙ্গে কতকটা লজ্জাও আছে। যে-কাজ করতে যান, মনে হয় পাছে বেদস্তুর হয়ে পড়ে। জাহাজে ইংরেজদের সঙ্গে মেশা বড়ো হয়ে ওঠে না। তারা টাটকা ভারতবর্ষ থেকে আসছে, 'হুজুর ধর্মাবতার'গণ দেশী লোক দেখলে নাক তুলে, ঘাড় বেঁকিয়ে চলে যায়। মাঝে মাঝে ভদ্র ইংরেজ দেখতে পাবে, তাঁরা তোমাকে নিতান্ত সঙ্গিহীন দেখে তোমার সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করবেন, তাঁরা যথার্থ ভদ্র, অর্থাৎ ভদ্র ও উচ্চ পরিবারের লোক। এখানকার গলিতে গলিতে যে 'জন-জোন্স্-টমাস'গণ কিলবিল করছে, তারা ভারতবর্ষের

যে-অঞ্চলে পদার্পণ করেন, সে-অঞ্চলে ঘরে ঘরে তাদের নাম রাষ্ট্র হয়ে যায়, যে-রাস্তায় তারা চাবুক হস্তে ঘোড়ায় চড়ে যায় (হয়তো সে চাবুক কেবলমাত্র ঘোড়ার জন্যেই নয়) সে রাস্তাসুদ্ধ লোক শশব্যস্ত হয়ে তাদের পথ ছেড়ে দেয়, তাদের এক-একটা ইঙ্গিতে ভারতবর্ষের এক-একটা রাজার সিংহাসন কেঁপে ওঠে এ-রকম অবস্থায় তাদের যে বিকৃতি ঘটে আমি তো তাতে বিশেষ অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাই নে। কোনো জন্মে যে-মানুষ ঘোড়া চালায় নি, তাকে ঘোড়া চালাতে দাও, ঘোড়াকে চাবুক মেরে মেরেই জর্জরিত করবে; সে জানে না যে, একটু লাগাম টেনে দিলেই তাকে চালানো যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে এক-একটি ভদ্র সাহেবকে দেখা যায়, তাঁরা অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানত্বের ঘোরতর সংক্রামক রোগের মধ্যে থেকেও বিশুদ্ধ থাকেন, অপ্রতিহত প্রভুত্ব ও ক্ষমতা পেয়েও উদ্ধত গর্বিত হয়ে ওঠেন না। সমাজ-শৃঙ্খল ছিন্ন হয়ে, সহস্র সেবকদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে ভারতবর্ষে থাকা উন্নত ও ভদ্র মনের একপ্রকার অগ্নিপরীক্ষা।

যা হক, এত ক্ষণে জাহাজ সাউদ্যাম্পটনে এসে পৌঁচেছে। বঙ্গীয় যাত্রীরা বিলেতে এসে পৌঁছলেন। লণ্ডন উদ্দেশে চললেন। ট্রেন থেকে নাববার সময় কেজন ইংরেজ গার্ড এসে উপস্থিত। বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, তাঁদের কী প্রয়োজন আছে, কী করে দিতে হবে। তাঁদের মোট নাবিয়ে দিলে, গাড়ি ডেকে দিলে, তাঁরা মনে মনে বললেন, “বাঃ! ইংরেজরা কী ভদ্র!” ইংরেজরা যে এত ভদ্র হতে পারে, তা তাঁদের জ্ঞান ছিল না। তার হস্তে একটি শিলিং গুঁজে দিতে হল বটে। তা হক একজন নবাগত বঙ্গ-যুবক একজন যে -কোনো শ্বেতাঙ্গের কাছ থেকে একটি মাত্র সেলাম পেতে অকাতরে এক শিলিং ব্যয় করতে পারেন। আমি যাঁদের কাছ থেকে সব কথা শুনতে পাই, তাঁরা অনেক বৎসর বিলেতে আছেন, বিলেতের নানাপ্রকার ছোটোখাটো জিনিস দেখে তাঁদের প্রথম কী রকম মনে হয়েছিল, তা তাঁদের স্পষ্ট মনে নেই। যে-সব বিষয়ে তাঁদের বিশেষ মনে লেগেছিল, তাই এখনো তাঁদের মনে আছে।

তাঁরা বিলেতে অসবার পূর্বে তাঁদের বিলিতি বন্ধুরা এখানে তাঁদের জন্যে ঘর ঠিক করে রেখেছিলেন। ঘরে ঢুকে দেখেন, ঘরে কার্পেট পাতা,

দেয়ালে ছবি টাঙানো, একটা বড়ো আয়না এক জায়গায় ঝোলানো, কৌচ, কতকগুলি চৌকি, দুই-একটা কাঁচের ফুলদানি, এক পাশে একটি ছোটো পিয়ানো। কী সর্বনাশ! তাঁদের বন্ধুদের ডেকে বললেন, “আমরা কি এখেনে বড়োমানুষি করতে এসেছি? আমাদের বাপু বেশি টাকাকড়ি নেই, এ রকম ঘরে থাকা আমাদের পোষাবে না!” বন্ধুরা অত্যন্ত আমোদ পেলেন, কারণ তখন তাঁরা একেবারে ভুলে গেছেন যে বহুপূর্বে তাঁদেরও একদিন এইরকম দশা ঘটেছিল। নবাগতদের নিতান্ত অন্নজীবী বাঙালি মনে করে অত্যন্ত বিজ্ঞতার স্বরে বললেন, “এখানকার সকল ঘরই এইরকম!” নবাগত ভাবলেন, আমাদের দেশে সেই একটা স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে একটা তক্তা ও তার উপরে একটা মাদুর পাতা, ইতস্তত হুঁকোর বৈঠক, কোমরে একটুখানি কাপড় জড়িয়ে জুতোজোড়া খুলে দু-চার জন মিলে শতরঞ্চ খেলা চলছে, বাড়ির উঠোনে একটা গোরু বাঁধা, দেয়ালে গোবর দেওয়া, বারান্দা থেকে ভিজে কাপড় শুকোচ্ছে ইত্যাদি। তাঁরা বলেন, প্রথম প্রথম দিনকতক চৌকিতে বসতে, কৌচে শুতে, টেবিলে খেতে, কার্পেটে বিচরণ করতে অত্যন্ত সংকোচ বোধ হত। সোফায় অত্যন্ত আড় হয়ে বসতেন, ভয় হত, পাছে সোফা ময়লা হয়ে যায় বা তার কোনোপ্রকার হানি হয়। মনে হত সোফাগুলো কেবল ঘর সাজাবার জন্যেই রেখে দেওয়া, এগুলো ব্যবহার করতে দিয়ে মাটি করা কখনোই ঘরের কর্তার অভিপ্রেত হতে পারে না। ঘরে এসে প্রথম মনের ভাব তো এই, তার পরে আর একটি প্রধান কথা বলা বাকি।

বিলেতে ছোটোখাটো বাড়িতে “বাড়িওআলা” বলে একটা জীবের অস্তিত্ব আছে হয়তো, কিন্তু যাঁরা বাড়িতে থাকেন, “বাড়িওআলী”র সঙ্গেই তাঁদের সমস্ত সম্পর্ক। ভাড়া চুকিয়ে দেওয়া, কোনোপ্রকার বোঝাপড়া, আহারাদির বন্দেবস্ত করা, সে সমস্তই বাড়িওআলীর কাছে। আমার বন্ধুর যখন প্রথম পদার্পণ করলেন, দেখলেন, এক ইংরজনী এসে অতি বিনীত স্বরে তাঁদের ‘সুপ্রভাত’ অভিবাদন করলে, তাঁরা নিতান্ত শশব্যস্ত হয়ে ভদ্রতার যথাযোগ্য প্রতিদান দিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন, তাঁদের অন্যান্য ইঙ্গবঙ্গ বন্ধুগণ তার সঙ্গে অতি অসংকুচিত

স্বরে কথাবার্তা আরম্ভ করে দিলেন, তখন আর তাঁদের বিসময়ের আদি অন্ত রই না। মনে করো এক সজীব বিবিসাহেব জুতো-পরা, টুপি-পরা, গাউন-পরা! তখন ইঙ্গবঙ্গ বন্ধুদের উপর সেই নবাগত বঙ্গযুবকদের ভক্তির উদয় হল, কোনো কালে যে এই অসমসাহসিকদের মতো তাঁদেরও বুকের পাটা জন্মাবে, তা তাঁদের সম্ভব বোধ হল না। যা হক, এই নবাগতদের যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে ইঙ্গবঙ্গ বন্ধুগণ স্ব স্ব আলয়ে গিয়ে সপ্তাহকাল ধরে তাঁদের অজ্ঞতা নিয়ে অপর্যাপ্ত হাস্যকৌতুক করলেন। পূর্বোক্ত গৃহকর্ত্রী প্রত্যহ নবাগতদের অতি বিনীতভাবে, কী চাই, কী না চাই, জিজ্ঞাসা করতে আসত। তাঁরা বলেন, এই উপলক্ষে তাঁদের অত্যন্ত আহ্লাদ হত। তাঁদের মধ্যে একজন বলেন, প্রথম দিন যেদিন তিনি এই ইংরেজ মেয়েকে একটুখানি ধমকাতে পেরেছিলেন, সেদিন সমস্ত দিন তাঁর মন অত্যন্ত প্রফুল্ল ছিল। অথচ সেদিন সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে নি, পর্বত চলাফেরা করে বেড়ায় নি, বহ্নিও শীতলতা প্রাপ্ত হয় নি।

কার্পেট-মোড়া ঘরে তাঁরা সুখে বাস করছেন। তাঁরা বলেন, “আমাদের দেশে নিজের ঘর বলে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ ছিল না; যে-ঘরে বসতেম, সে-ঘরে বাড়ির দশজনে যাতায়াত করছেই। আমি একপাশে লিখছি, দাদা একপাশে একখানা বই হাতে করে ঢুলছেন, আর-এক দিকে মাদুর পেতে গুরুমশায় ভুলুকে উচ্চৈঃস্বরে সুর করে করে নামতা পড়াচ্ছেন। এখানে আমার নিজের ঘর; সুবিধামতো করে বইগুলি এক দিকে সাজালেম, লেখবার সরঞ্জাম একদিকে গুছিয়ে রাখলেম, কোনো ভয় নেই যে, একদিন পাঁচটা ছেলে মিলে সমস্ত ওলট-পালট করে দেবে, আর-এক দিন দুটোর সময় কলেজ থেকে এসে দেখব, তিনটে বই পাওয়া যাচ্ছে না, অবশেষে অনেক খোঁজ-খোঁজ করে দেখা যাবে বইগুলি নিয়ে আমার ছোটো ভাগ্নীটি তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহচরীদের ডেকে ছবি দেখতে ঘোরতর ব্যস্ত। এখানে নিজের ঘরে বসে থাকো, দরজাটি ভেজানো, সট করে না বলে কয়ে কেউ ঘরে মধ্যে এসে পড়ে না, ঘরে ঢোকবার আগে দরজায় হব্দ করে, ছেলেপিলেগুলো চারিদিকে চেঁচামেচি কান্নাকাটি জুড়ো দেয় নি,

নিরিবিলি নিরালা, কোনো হাঙ্গামা নেই।” দেশের সম্বন্ধে মেজাজ খিটখিটে হয়ে ওঠে। প্রায় দেখা যায় আমাদের দেশের পুরুষেরা এখানকার পুরুষ-সমাজে বড় মেশেন না। কারণ এখানকার পুরুষসমাজে মিশতে গেলে একরকম বলিষ্ঠ স্ফূর্তির ভাব থাকা চাই, বাধো-বাধো মিঠে সুরে দু-চারটে সসংকোচ ‘ হাঁ না’ দিয়ে গেলে চলে না। বাঙালি অভ্যাগত ডিনার টেবিলে তাঁর পার্শ্বস্থ মহিলাটির কানে কানে মিষ্টি মিষ্টি টুকরো টুকরো দুই-একটি কথা মৃদু ধীর স্বরে কইতে পারেন, আর সে মহিলার সহবাসে তিনি যে স্বর্গ-সুখ উপভোগ করছেন, তা তাঁর মাথার চুল থেকে বুট জুতোর আগা পর্যন্ত প্রকাশ হতে থাকে, সুতরাং মেয়ে-সমাজে বাঙালিরা পসার করে নিতে পারেন। আমাদের দেশে ঘোমটাচ্ছন্ন-মুখচন্দ্রশোভী অনালোকিত অন্তঃপুর থেকে এখানকার রূপের মুক্ত জ্যোৎস্নায় এসে আমাদের মন-চকোর প্রাণ খুলে গান গেয়ে ওঠে।

এক দিন আমাদের নবাগত বঙ্গযুবক তাঁর প্রথম ডিনারের নিমন্ত্রণে গিয়েছেন। নিমন্ত্রণসভায় বিদেশীর অত্যন্ত সমাদর। তিনি গৃহস্বামীর যুবতী কন্যা মিস অমুকের বাহু গ্রহণ করে আহারের টেবিলে গিয়ে বসলেন। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মুক্তভাবে মিশতে পাই নে, তার পরে নতুন নতুন এসে এখানকার স্ত্রীলোকদের ভাবও ঠিক বুঝতে পারি নে। কোনো সামাজিকতার অনুরোধে তারা আমাদের মনোরঞ্জন করবার জন্যে যেসেকল কথাবার্তা হাস্যালাপ করে, আমরা তার ঠিক মর্ম-গ্রহণ করতে পারি নে, আমরা হঠাৎ মনে করি, আমাদের উপরেই এই মহিলাটির বিশেষ অনুকূল দৃষ্টি। আমাদের বঙ্গযুবকটি মিসকে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত অনেক কথা জানালেন। বললেন তাঁর বিলেত অত্যন্ত ভালো লাগে, ভারতবর্ষে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না, ভারতবর্ষে অনেক প্রকার কুসংস্কার আছে। শেষকালে দুই-একটি সাজানো কথাও বললেন। যথা, তিনি সুন্দরবনে বাঘ শিকার করতে গিয়ে একবার মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলেন। মিসটি অতি সহজে বুঝতে পারলেন যে, এই যুবকের তাঁকে অত্যন্ত ভালো লেগেছে।

তিনি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হলেন ও তাঁর মিষ্টতম বাক্যবাণ যুবকের প্রাণে হানতে লাগলেন। “আহা, কী গোছালো কথা! কোথায় আমাদের দেশের মেয়েদের মুখের সেই নিতান্ত শ্রমলভ্য দুই-একটি ‘হাঁ না’ যা এত মৃদু যে ঘোমটার সীমার মধ্যেই মিলিয়ে যায়; আর কোথায় এখানকার বিম্বৌষ্ঠ-নিঃসৃত অজস্র মধুধারা, যা অযাচিতভাবে মদিরার মতো শিরায় শিরায় প্রবেশ করে!”

হয়তো বুঝতে পারছে, কী কী মসলার সংযোগে বাঙালি বলে একটা পদার্থ ক্রমে ইঙ্গবঙ্গ নামে একটা খিচুড়িতে পরিণত হয়। সমস্ত প্রক্রিয়াটা বিস্তারিত করে লিখতে পারি নি। এত সব ছোটো ছোটো বিষয়ের সমষ্টি মানুষের মনে অলক্ষিত পবির্তন উপস্থিত করে যে, সে-সকল খুঁটিনাটি করে বর্ণনা করতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়।

ইঙ্গবঙ্গদের ভালো করে চিনতে গেলে তাঁদের তিন রকম অবস্থায় দেখতে হয়। তাঁরা ইংরেজদের সম্মুখে কী রকম ব্যবহার করেন, বাঙালিদের সম্মুখে কী রকম ব্যবহার করেন ও তাঁদের স্বজাত ইঙ্গবঙ্গদের সম্মুখে কী রকম ব্যবহার করেন। একটি ইঙ্গবঙ্গকে একজন ইংরেজের সম্মুখে দেখো, চক্ষু জুড়িয়ে যাবে। ভদ্রতার ভারে প্রতি কথায় ঘাড় নুয়ে নুয়ে পড়ছে, তর্ক করবার সময় অতিশয় সাবধানে নরম করে প্রতিবাদ করেন ও প্রতিবাদ করতে হল বলে অপর্যাপ্ত দুঃখ প্রকাশ করেন, অসংখ্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কথা কন আর না কন, একজন ইংরেজের কাছে একজন ইঙ্গবঙ্গ চুপ করে বসে থাকলেও তাঁর প্রতি অঙ্গভঙ্গী, প্রতি মুখের ভাবে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ হতে থাকে। কিন্তু তাঁকেই আবার তাঁর স্বজাতিমণ্ডলে দেখো, দেখবে তাঁর মেজাজ। বিলেতে যিনি তিন বৎসর আছেন, এক বৎসরের বিলেতবাসীর কাছে তাঁর অত্যন্ত পায়া ভারি। এই তিন বৎসর ও এক বৎসরের মধ্যে যদি কখনো তর্ক ওঠে, তা হলে তুমি “তিন বৎসরের” প্রতাপটা একবার দেখতে পাও। তিনি প্রতি কথা এমন ভাবে, এমন স্বরে বলেন যে, যেন সেই কথাগুলি নিয়ে সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ বোঝাপড়া হয়ে একটা স্থিরসিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। যিনি প্রতিবাদ করছেন, তাঁকে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেন ‘ভ্রান্ত’ কখনো বা মুখের উপর বলেন ‘মূর্খ’।

সেদিন এক জন গল্প করছিলেন, যে তাঁকে আর-এক জন বাঙালি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, "মশায়ের কী কাজ করা হয়?" এই গল্প শুনবামাত্র আমাদের একজন ইঙ্গবঙ্গ বন্ধু নিদারুণ ঘৃণার সঙ্গে বলে উঠলেন, "দেখুন দেখি, কী বার্বারাস!" ভাবটা এই যে, যেমন মিথ্যে কথা না বলা, চুরি না করা নীতি-শাস্ত্রের কতকগুলি মূল নিয়ম, তেমনি অন্য মানুষকে তার জীবিকার কথা জিজ্ঞাসা না করাও একটা মূল নিয়মের মধ্যে।

সেদিন এক জায়গায় আমাদের দেশের শ্রাদ্ধের কথা হচ্ছিল, বাপ-মার মৃত্যুর পর আমরা হবিষ্য করি, বেশভূষা করি নে ইত্যাদি। শুনে একজন ইঙ্গবঙ্গ যুবক অধীর ভাবে আমাকে বলে উঠলেন যে, "আপনি অবিশ্যি, মশায়, এ-সকল অনুষ্ঠান ভালো বলেন না।" আমি বললেম, "কেন নয়? আমি দেখছি ইংরেজরা যদি আত্মীয়ের মৃত্যু উপলক্ষ্যে হবিষ্যান্ন খেত, আর আমাদের দেশের লোকরা না খেত, তা হলে হবিষান্ন খায় না বলে আমাদের দেশের লোকের উপর তোমার দ্বিগুণতর ঘৃণা হত, ও মনে করতে, হবিষ্যান্ন খায় না বলেই আমাদের দেশের এত দুর্দশা।" তুমি হয়তো জানো ইংরেজরা এক টেবিলে তেরো জন খাওয়া অলক্ষণ মনে করে, তাদের বিশ্বাস, তা হলে এক বৎসরের মধ্যে তাদের একজনের মৃত্যু হবেই। এক জন ইঙ্গবঙ্গ যখন নিমন্ত্রণ করেন তখন কোনোমতে তেরো জন নিমন্ত্রণ করেন না, জিজ্ঞাসা করলে বলেন, "আমি নিজে বিশ্বাস করি নে, কিন্তু যাঁদের নিমন্ত্রণ করি তাঁরা পাছে ভয় নান তাই বাধ্য হয়ে এ নিয়ম পালন করতে হয়।" সেদিন এক জন ইঙ্গবঙ্গ তাঁর একটি আত্মীয় বালককে রবিবার দিনে রাস্তায় খেলা করতে যেতে বারণ করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, "রাস্তার লোকেরা কী মনে করবে?"

কতকগুলি বাঙালি বলেন, এখানকার মতো ঘর ভাড়া দেবার প্রথা তাঁরা আমাদের দেশে প্রচলিত করবেন। তাঁদের সেই একটিমাত্র সাধ। আর-এক জন বাঙালি বাংলা সমাজ সংস্কার করতে চান, বিলেতের সমাজে মেয়ে পুরুষে একত্রে নাচাটাই তাঁর চোখে অত্যন্ত ভালো লেগেছে। কতকগুলি

সাধারণ বিষয়ে আমাদের দেশের ও এদেশের মেয়েদের অমিল দেখে তার পরে তিনি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয় নিয়ে ছেলেমানুষের মতো খুঁতখুঁত করতে থাকেন। একজন ইঙ্গবঙ্গ নালিশ করছিলেন যে, আমাদের দেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজাতে পারে না, ও এখানকার মতো ভিজিটারদের সঙ্গে দেখা করতে ও ভিজিট প্রত্যর্পণ করতে যায় না। এই রকম ক্রমাগত প্রতি ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে এ-দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করে করে তাঁদের চটাভাব চটনমান যন্ত্রে ব্লাড হীট ছাড়িয়ে ওঠে। একজন ইঙ্গবঙ্গ তাঁর সমবেদক বন্ধুদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে বলছিলেন, যে, যখন তিনি মনে করেন যে, দেশে ফিরে গেলে তাঁকে চারি দিকে ঘিরে মেয়েগুলো প্যান প্যান করে কাঁদতে আরম্ভ করবে, তখন আর তাঁর দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। অর্থাৎ তিনি চান যে, তাঁকে দেখেবামাত্রই ‘ডিয়ার ডার্লিং’ বলে ছুটে এসে তাঁর স্ত্রী তাঁকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করে তাঁর কাঁধে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। ডিনারের টেবিলে কাঁটা ছুরি উল্টে ধরতে হবে, কি পাল্‌টে ধরতে হবে তাই জানবার জন্যে তাঁদের গবেষণা দেখলে তাঁদের উপর ভক্তির উদয় হয়। কোটের কোন ছাঁটটা ফ্যাশন-সংগত, আজকাল নোবিলিটি আঁট প্যান্টলুন পরেন কি ঢলকো পরেন, ওয়ালট্‌স্‌ নাচেন কি পোলকা মর্জুকা, মাছের পর মাংস খান কি মাংসের পর মাছ, সে-বিষয়ে তাঁরা অভ্রান্ত খবর রাখেন। ঐরকম ছোটোখাটো বিষয়ে এক জন বাঙালি যত দস্তুরেবেদস্তুর নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, এমন এ-দিশি করে না। তুমি যদি মাছ খাবার সময় ছুরি ব্যবহার কর তবে এক জন ইংরেজ তাতে বড়ো আশ্চর্য হবেন না, কেননা তিনি জানেন তুমি বিদেশী, কিন্তু একজন ইঙ্গবঙ্গ সেখানে উপস্থিত থাকলে তাঁর সেমলিং সল্টের আবশ্যক করবে। তুমি যদি শেরি খাবার গ্লাসে শ্যাম্পেন খাও তবে একজন ইঙ্গবঙ্গ তোমার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকবেন, যেন তোমার এই অজ্ঞতার জন্যে সমস্ত পৃথিবীর সুখ শান্তি নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে। সন্ধ্যেবেলায় তুমি যদি মর্নিং কোট পর, তা হলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট হলে জেলে নির্জনবাসের আজ্ঞা দিতেন। এক জন বিলেত-ফেরতা কাউকে

মটন দিয়ে রাই দিয়ে খেতে দেখলে বলতেন, “তবে কেন মাথা দিয়ে চল না?”

আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করে দেখেছি যে, বাঙালিরা ইংরেজদের কাছে স্বদেশের লোকেদের ও আচার-ব্যবহারের যত নিন্দে করেন, এমন এক জন ভারতদ্বেষী অ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ানও করেন না। তিনি নিজে ইচ্ছা করে কথা পাড়েন ও ভারতবর্ষের নানাপ্রকার কুসংস্কার প্রভৃতি নিয়ে প্রাণ খুলে হাস্যপরিহাস করেন। তিনি গল্প করেন যে, আমাদের দেশে বল্লভাচার্যের দল বলে একরকম বৈষ্ণবের দল আছে। তাদের সমস্ত অনুষ্ঠান সবিস্তারে বর্ণনা করতে থাকেন। সভার লোকদের হাসাবার অভিপ্রায়ে নেটিব নচ-গার্লরা কী রকম করে নাচে, অঙ্গভঙ্গী করে তার নকল করেন ও তাই দেখে সকলে হাসলে আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁর নিতান্ত ইচ্ছে, তাঁকে কেউ ভারতবর্ষীয় দলের মধ্যে গণ্য না করে। সাহেব-সাজা বাঙালিদের প্রতি পদে ভয়, পাছে তাঁরা বাঙালি বলে ধরা পড়েন। এক জন বাঙালি একবার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর এক জন ভারতবর্ষীয় এসে তাঁকে হিন্দুস্থানিতে দুই-এক কথা জিজ্ঞাসা করে, তিনি মহা খাপা হয়ে উত্তর না দিয়ে চলে যান। তাঁর ইচ্ছে, তাঁকে দেখে কেউ মনে না করতে পারে যে, তিনি হিন্দুস্থানি বোঝেন। একজন ইঙ্গবঙ্গ একটি ‘জাতীয় সংগীত’ রামপ্রসাদী সুরে রচনা করেছেন; এই গানটার একটু অংহ পূর্ব পত্রে লিখেছি, বাকি আর একটুকু মনে পড়েছে, এই জন্য আবার তার উল্লেখ করছি। এ গীত যাঁর রচনা, তিনি রামপ্রসাদের মতো শ্যামার উপাসক নন, তিনি গৌরীভক্ত। এই জন্যে গৌরীকে সম্বোধন করে বলছেন –

মা, এবার মলে সাহেব হব;
রাঙা চুলে হ্যাট বসিয়ে, পোড়া নেটিব নাম ঘোচাব।
সাদা হাতে হাত দিয়ে মা, বাগানে বেড়াতে যাব
(আবার) কালো বদন দেখলে পরে ‘ডার্কি’ বলেমুখফেরাব।

আমি পূর্বেই বিলাতে বাড়িওআলী শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছি। তারা বাড়ির লোকদের আবশ্যকমতো সেবা করে। অনেক ভাড়াটে থাকলে তারা চাকরানী রাখে বা অন্য আত্মীয়েরা তাদের সাহায্য করবার জন্যে থাকে। অনেকে সুন্দরী ল্যাণ্ডলেডি দেখে ঘর ভাড়া করেন। বাড়িতে পদার্পণ করেই ল্যাণ্ডলেডির যুবতী কন্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে নেন, দু-তিন দিনের মধ্যে তার একটি আদরের নামকরণ করা হয়, সপ্তাহ অতীত হলে তার নামে হয়তো একটা কবিতা রচনা করে তাকে উপহার দেন। সেদিন ল্যাণ্ডলেডির মেয়ে তাঁকে এক পেয়ালা চা এনে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, চায়ে কি চিনি দিতে হবে? তিনি হেসে বললেন, "না নেলি, তুমি যখন ছুঁয়ে দিয়েছ, তখন আর চিনি দেবার দরকার দেখছি নে!" আমি জানি, এক জন ইঙ্গবঙ্গ তাঁর বাড়ির দাসীদের মেজদিদি সেজদিদি বলে ডাকতেন।

আমি এক জনকে জানি, তিনি তাঁর মেজদিদি-সেজদিদিবর্গকে এত মান্য করে চলতেন যে, তাঁর ঘরে বা তাঁর পাশের ঘরে যদি এদের মধ্যে কেউ উপস্থিত থাকত, এবং সে অবস্থায় যদি তাঁর কোনো ইঙ্গবঙ্গ বন্ধু গান বা হাস্যপরিহাস করতেন তা হলে তিনি মহা অপ্রতিভ হয়ে বলে উঠতেন, "আরে চুপ করো, চুপ করো, মিস এমিলি কী মনে করবেন?" আমার মনে আছে, দেশে থাকতে একবার এক ব্যক্তি বিলেত থেকে ফিরে গেলে পর, আমরা তাকে খাওয়াই। খাবার সময় তিনি নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, "এই আমি প্রথম খাচ্ছি, যেদিন আমার খাবার টেবিলে কোনো লেডি নেই।" এক জন ইঙ্গবঙ্গ একবার তাঁর কতকগুলি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। খাবার টেবিলে কতকগুলি ল্যাণ্ডলেডি ও দাসী বসে ছিল, তাদের এক জনের ময়লা কাপড় দেখে নিমন্ত্রণকর্তা তাকে কাপড় বদলে আসতে অনুরোধ করেছিলেন, শুনে সে বললে, "যাকে ভালোবাসা যায়, তাকে ময়লা কাপড়েও ভালোবাসা যায়।"

এইবার ইঙ্গবঙ্গদের একটি গুণের কথা তেমাকে বলছি। এখানে যাঁরা আসেন, অনেকেই কবুল করেন না যে তাঁরা বিবাহিত, যেহেতু স্বভাবতই যুবতী কুমারী সমাজে বিবাহিতদের দাম অল্প। অবিবাহিত বলে পরিচয় দিলে এখানকার অবিবাহিতাদের সঙ্গে মিশে অনেক যথেচ্ছাচার করা যায়,

কিন্তু বিবাহিত বলে জানলে তোমার অবিবাহিত সঙ্গীরা ও-রকম অনিয়ম করতে দেয় না, সুতরাং অবিবাহিত বলে পরিচয় দিলে অনেক লাভ আছে।

অনেক ইঙ্গবঙ্গ দেখতে পাবে তাঁরা আমার এই বর্ণনার বহির্গত। কিন্তু সাধারণত ইঙ্গবঙ্গত্বের লক্ষণগুলি আমি যতদূর জানি তা লিখেছি।

ভারতবর্ষে গিয়ে ইঙ্গবঙ্গদের কী রকম অবস্থা হয় সে-বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতাও নেই, বক্তব্যও নেই। কিন্তু কিছু কাল ভারতবর্ষে থেকে তার পরে ইংলণ্ডে এলে কী রকম ভাব হয় তা আমি অনেকের দেখেছি। তাঁদের ইংলণ্ড আর তেমন ভালো লাগে না; অনেক সময়ে তাঁরা ভেবে পান না, ইংলণ্ড বদলেছে, কি তাঁরা বদলেছেন। আগে ইংলণ্ডের অতি সামান্য জিনিস ভালো লাগত; এখন ইংলণ্ডের শীত ইংলণ্ডের বর্ষা তাঁদের ভাল লাগছে না, এখন তাঁরা ভারতবর্ষে ফিরে যেতে হলে দুঃখিত হন না। তাঁরা বলেন, আগে তাঁরা ইংলণ্ডের স্ট্রবেরিই ফল অত্যন্ত ভালবাসতেন। এমনকি তাঁরা যতরকম ফল খেয়েছেন তার মধ্যে স্ট্রবেরিই তাঁদের সকলের চেয়ে স্বাদু মনে হত। কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যে স্ট্রবেরির স্বাদ বদলে গেল নাকি। এখন দেখছেন তার চেয়ে অনেক দিশি ফল তাঁদের ভালো লাগে। আগে ডেভনশিয়রের ক্রীম তাদের এত ভালো লাগত যে, তার আর কথা নেই, কিন্তু এখন দেখছেন আমাদের দেশের ক্ষীর তার চেয়ে ঢের ভালো। তাঁরা ভারতবর্ষে গিয়ে স্ত্রীপুত্রপরিবার নিয়ে সংসারী হয়ে পড়েন, রোজগার করতে আরম্ভ করেন, ভারতবর্ষের মাটিতে তাদের শিকড় এক রকম বসে যায়। মনটা কেমন শিথিল হয়ে আসে, তখন পায়ের উপর পা দিয়ে টানা পাখার বাতাস খেয়ে কোনোপ্রকার দিন কাটিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত থাকেন। বিলেতে আমোদ বিলাস ভোগ করতে গেলেও অনেক উদ্যমের আবশ্যক করে। এখানে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে হলে গাড়ির চলন নেই, হাত-পা নাড়তে চাড়তে দশটা চাকরের উপর নির্ভর করলে চলে না। গাড়িভাড়া অত্যন্ত বেশি, আর চাকরের মাইনে মাসে সাড়ে তিন টাকা নয়। থিয়েটার দেখতে যাও; সন্ধ্যেবেলা বৃষ্টি পড়ছে, পথে কাদা, একটা ছাতা ঘাড়ে করে মাইল কতক ছুটোছুটি করে তবে

ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারবে। যখন রক্তের তেজ থাকে তখন এ-সকল পেরে ওঠা যায়।

য়ুরোপ-প্রবাসীর ষষ্ঠ পত্র

আমাদের ব্রাইটনের বাড়িটি সমুদ্রের কাছে একটি নিরালা জায়গায়। এক সার কুড়ি-পঁচিশটি বাড়ি, বাড়িগুলির নাম মেডিনা ভিলাজ। হঠাৎ মনে হয়েছিল বাগান-বাড়ি। এখানে এসে দেখি, 'ভিলা'ত্বর মধ্যে আমাদের বাড়ির সামনে দু-চার হাত জমিতে দু-চারটে গাছ পোঁত আছে। বাড়ির দরজায় একটা লোহার কড়া লাগানো সেইটেতে ঠক ঠক করলেম, আমাদের ল্যাণ্ডলেডি এসে দরজা খুলে দিলে। আমাদের দেশের তুলনায় এখানকার ঘরগুলো লম্বা চওড়া ও উঁচুতে ঢের ছোটো। চারিদিকে জানলা বন্ধ, একটু বাতাস আসবার জো নেই, কেবল জানলাগুলো সমস্ত কাঁচের বলে আলো আসে। শীতের পক্ষে এ-রকম ছোটোখাটো ঘরগুলো ভালো, একটু আগুন জ্বালালেই সমস্ত বেশ গরম হয়ে ওঠে, কিন্তু তা হক, যেদিন মেঘে চারদিক অন্ধকার, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, তিনি-চার দিন ধরে মেঘ-বৃষ্টি-অন্ধকারের এক মুহূর্ত বিরাম নেই সেদিন এই ছোটো অন্ধকার ঘরটার এক কোণে বসে আমার মনটা অত্যন্ত বিগড়ে যায়, কোনোমতে সময় কাটে না। খালি আমি বলে নয়, আমার ইংরেজ আলাপীরা বলেন সে-রকম দিনে তাঁদের অত্যন্ত swear করার প্রবৃত্তি জন্মায় (swear করা রোগটা সম্পূর্ণ য়ুরোপীয়, সুতরাং ওর বংলা কোনো নাম নেই), মনের ভাবটা অধার্মিক হয়ে ওঠে। যা হক এখানকার ঘর-দুয়ারগুলি বেশ পরিষ্কার; বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে কোথাও ধুলো দেখবার জো নেই, মেজের সর্বাঙ্গ কার্পেট প্রভৃতি মোড়া, সিঁড়িগুলি পরিষ্কার তক তক করছে। চোখে দেখতে খারাপ হলে এরা সইতে পারে না। প্রতি সামান্য বিষয়ে এদের ভালো দেখতে হওয়াটা প্রধান আবশ্যক। শোকবস্ত্রও সুশ্রী দেখতে হওয়া চাই। আমরা যাকে পরিষ্কার বলি সেটা কিন্তু আর একটা জিনিস। এখানকার লোকেরা খাবার পরে আঁচায় না, কেন না আঁচানো জল মুখ

থেকে পড়ছে সে অতি কুশ্রী দেখায়। শ্রী হানি হয় বলে পরিষ্কার হওয়া হয় না। এখানে যে-রকম কাসি-সর্দির প্রাদুর্ভাব, তাতে ঘরে একটা পিকদান নিতান্ত অবশ্যক, কিন্তু তার ব্যবহার কুশ্রী বলে ঘরে রাখা হয় না, রুমালে সমস্ত কাজ চলে। আমাদের দেশের যে রকম পরিষ্কার ভাব, তাতে আমরা বরঞ্চ ঘরে একটা পিকদানি রাখতে পারি, কিন্তু জামার পকেটে এ-রকম একটা বীভৎস পদার্থ বহন করতে ঘৃণা হয়। কিন্তু এখানে চোখেরই অধিপত্য। রুমাল কেউ দেখতে পাবে না, তা হলেই হল। চুলটি বেশ পরিষ্কার করে আঁচড়ানো থাকবে, মুখটি ও হাত দুটি সাফ থাকবে, স্নান করবার বিশেষ দরকার নেই। এখানে জামার উপরে অন্যান্য অনেক কাপড় পরে বলে জামার সমস্তটা দেখা যায় না, খালি বুকের ও হাতের কাছে একটু বেরিয়ে থাকে। একরকম জামা আছে, তার যতটুকু বেরিয়ে থাকে ততটুকু জোড়া দেওয়া, সেটুকু খুলে ধোবার বাড়ি দেওয়া যায়; তাতে সুবিধে হচ্ছে যে ময়লা হয়ে গেলে জামা বদলাবার কোনো আবশ্যক করে না, সেই জোড়া টুকরোগুলো বদলালেই হল। এখানকার দাসীদের কোমরে এক আঁচল-বাঁধা থাকে, সেইটি দিয়ে তারা না পোঁছে এমন পদার্থ নেই; খাবার কাঁচের প্লেট যে দেখছ ঝক ঝক্ করছে, সেটিও সেই সর্ব-পাবক-আঁচল দিয়ে মোছা হয়েছে, কিন্তু তাতে কী হানি, কিছু খারাপ দেখাচ্ছে না। এখানকার লোকেরা অপরিষ্কার নয়, আমাদের দেশে যাকে ‘নোংরা’ বলে তাই। এখানে পরিষ্কার ভাবের যে অভাব আমরা দেখতে পাই, সে অনেকটা শীতের জন্যে। আমরা যে-কোনো জিনিস হক না কেন, জল দিয়ে পরিষ্কার না হলে পরিষ্কার মনে করি নে। এখানে অত জল নিয়ে নাড়াচাড়া পোষায় না। তাছাড়া শীতের জন্য এখানকার জিনিসপত্র শীঘ্র নোংরা হয়ে ওঠে না। এখানে শীতে ও গায়ের আবরণ থাকাতে শরীর তত অপরিষ্কার হয় না। এখানে জিনিসপত্র পচে ওঠে না। এইরকম পরিষ্কারের পক্ষে নানা বিষয়ে সুবিধে। আমাদের যেমন পরিষ্কার ভাব আছে, তেমনি পরিষ্কার হওয়ার বিষয়ে অনেক ঢিলেমিও

আছে। আমাদের দেশের পুষ্করিণীতে কী না ফেলে? অপরিষ্কার জলকুণ্ডের স্নান; তেল মেখে দুটো ডুব দিলেই আমরা শুচিতা কল্পনা করি। আমরা নিজের শরীর ও খাওয়া-দাওয়া সংক্রান্ত জিনিসের বিষয়ে বিশেষ পরিষ্কার থাকি, কিন্তু ঘরদুয়ার যথোচিত পরিষ্কার করি নে। এমন কি অস্বাসথ্যকর করে তুলি।

আমাদের দুই-একটি করে আলাপী হতে লাগল। ডাক্তার ম—এক জন আধবুড়ো চিকিৎসাব্যবসায়ী। তিনি এক জন প্রকৃত ইংরেজ, ইংলণ্ডের বহির্ভূত কোনো জিনিস তাঁর পছন্দসই নয়। তাঁর কাছে ক্ষুদ্র ইংলণ্ডই সমস্ত পৃথিবী, তাঁর কল্পনা কখনো ডোভার প্রণালী পার হয় নি। তাঁর কল্পনার এমন অভাব যে, তিনি মনে করতে পারেন না যারা বাইবেলের দশ অনুশাসন মানে না, তাদের মিথ্যে কথা বলতে কী করে সংকোচ হতে পারে। অখ্রীষ্ট লোকদের নীতির বির এই তাঁর প্রধান যুক্তি। যে ইংরেজ নয়, যে খ্রীষ্টান নয়, এমন একটা অপূর্ব সৃষ্টি দেখলে তার মনুষ্যত্ব কী করে থাকতে পার ভেবে পান না। তাঁর মটো হচ্ছে Gladly he would learn and gladly teach, কিন্তু আমি দেখলুম তাঁর লার্ন করবার ঢের আছে, কিন্তু টীচ করবার মতো সম্বল বেশি নেই। তাঁর স্বদেশীয় সাহিত্যের বিষয়ে তিনি আশ্চর্য কম জানেন; কতকগুলি মাসিক পত্রিকা পড়ে তিনি প্রতি মাসে দুই-চারিটি করে ভাসা ভাসা জ্ঞান লাভ করেন। তিনি কল্পনা করতে পারেন না একজন ভারতীয় কী করে এডুকেটেড হতে পারে। এখানকার মেয়েরা শীতকালে হাত গরম রাখবার জন্যে একরকম গোলাকার লোমশ পদার্থের মধ্যে হাত গুঁজে রাখ, তাকে মাফ্ বলে। প্রথম বিলেতে এসে সেই অপূর্ব পদার্থ যখন দেখি, তখন ডাক্তার ম—কে সে-দ্রব্যটা কী জিজ্ঞাসা করি। আমার অজ্ঞতায় তিনি আকাশ থেকে পড়লেন। এখানকার অনেক লোকের রোগ দেখেছি, তাঁরা আশা করেন, আমরা তাঁদের সমাজের প্রত্যেক ছোটোখাটো বিষয় জানব। এক দিন একটা নাচে গিয়েছিলুম, এক জন মেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলুম, “বধূটিকে (birde) তোমার কী রকম লাগছে? আমি জিজ্ঞাসা করলমু, “বধূটি কে?” অতগুলি মেয়ের মধ্যে

এক জন নববধূ কোথায় আছেন তা আমি জানতুম না। শুনে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন, তিনি বললেন, “তার মাথায় কমলালেবুর ফুল দেখে চিনতে পার নি?”

দুই মিস ক–র সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরা এখানকার পাদরির মেয়ে। পাড়ার পরিবারদের দেখাশুনো, রবিবাসরিক স্কুলে বন্দোবস্ত করা, শ্রমিকদের জন্যে টেম্পারেন্স সভা স্থাপন ও তাদের আমোদ দেবার জন্যে সেখানে গিয়ে গানবাজনা করা–এই সকল কাজে তাঁরা দিনরাত্রি ব্যস্ত আছেন। বিদেশী বলে আমাদের তাঁরা অত্যন্ত যত্ন করতেন। নগরে কোথাও আমোদ-উৎসব হলে আমাদের খবর দিতেন, আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন, অবসর পেলে সকালে কিংবা সন্ধ্যেবেলায় এসে আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন, ছেলেদের নিয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে গান শেখাতেন, এক-এক দিন তাঁদের সঙ্গে রাস্তায় বেড়াতে যেতুম। এইরকম আমাদের যথেষ্ট যত্ন ও আদর করতেন। বড়ো মিস ক–অত্যন্ত ভালোমানুষ ও গম্ভীর। একটা কথার উত্তর দিতে কেমন থতমত খেতেন। “হাঁ–না–তা হবে–জানি নে” এইরকম তাঁর উত্তর। এক-এক সময় কী বলবেন ভেবে পেতেন না, এক-এক সময় একটা কথা বলতে বলতে মাঝখানে থেমে পড়তেন, আর কথা জোগাত না, কোনো বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করলে বিব্রত হয়ে পড়তেন, আর কথা জোগাত না, কোনো বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করলে বিব্রত হয়ে পড়তেন। যদি জিজ্ঞাসা করা যেত, “আজ কি বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে” তিনি বলতেন, “কী করে বলব।” তিনি বুঝতেন না যে অভ্রান্ত বেদবাক্য শুনতে চাচ্ছি নে। তিনি আন্দাজ করতে নিতান্ত নারাজ। ছোটো মিস ক–র মতো প্রশান্ত প্রফুল্ল ভাব আর কারো দেখি নি। দেখে মনে হয় কোনো কালে তাঁর মনের কোনোখানে আঁচড় পড়ে নি। খুব ভালোমানুষ, সর্বদাই হাসিখুশি গল্প। কাপড়চোপড়ের আড়ম্বর নেই–কোনোপ্রকার ভান নেই; অত্যন্ত সাদাসিদে।

ডাক্তার ম–র বাড়িতে একদিন আমাদের সান্ধ্যনিমন্ত্রণ হল। খাওয়াই এখানকার নেমন্তন্নের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়

গানবাজনা আমোদ-প্রমোদের জন্যই দশজনকে ডাকা। আমরা সন্ধ্যের সময় গিয়ে হাজির হলুম। একটি ছোটো ঘরে অনেকগুলি মহিলা ও পুরুষের সমাগম হয়েছে। ঘরে প্রবেশ করে কর্তা গিন্নিকে আমাদের সম্মান জানালুম। সমাগত লোকদের সঙ্গে যথাযোগ্য অভিবাদন সম্ভাষণ ও আলাপ হল। ঘরে জায়গার এত টানাটানি ও লোক এত বেশি যে চৌকির অত্যন্ত অভাব হয়েছিল; অধিকাংশ পুরুষে মিলে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছিলুম। নতুন কোনো অভ্যাগত মহিলা এলে গিন্নি কিংবা কর্তা তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন, আলাপ হবামাত্র তাঁর পাশে গিয়ে এক বার বসছি কিংবা দাঁড়াচ্ছি ও দুই-একটা করে কথাবার্তা আরম্ভ করছি। প্রায় আবহাওয়া নিয়ে কথার আরম্ভ; মহিলাটি বলেন "ড্রেডফুল ওয়েদার।" তাঁর সঙ্গে আমার নিসংশয়ে মতের ঐক্য হল। তার পরে তিনি অনুমান করলেন যে আমাদের পক্ষে অর্থাৎ ভারতীয়দের পক্ষে এমন ওয়েদার বিশেষ ট্রায়িং ও আশা করলেন আকাশ শীঘ্র পরিষ্কার হয়ে যাবে ইত্যাদি। তার পরে এই সূত্রে নানা কথা। সভার মধ্যে দুই জন সুন্দরী উপস্থিত ছিলেন। বলা বাহুল্য যে তাঁরা জানতেন তাঁরা সুন্দরী। এখানে সৌন্দর্যের পুজো হয়; এখানে রূপ কোনোমতে আত্মবিস্মৃত থাকতে পারে না, রূপাভিমান সুপ্ত থাকতে পার না; চারদিক থেকে প্রশংসার কোলাহল তাকে জাগিয়ে তোলে। নাচঘরে রূপসীর দর অত্যন্ত চড়া; নাতে তাঁর সাহচর্য-সুখ পাবার জন্যে দরখাস্তের পর দরখাস্ত আসছে; তাঁর তিলমাত্র কাজ করে দেবার জন্যে বহু লোক প্রস্তুত। রূপবান পুরুষদেরও যথোচিত আদর আছে। তারা এখানকার ড্রয়িং রুমের ডার্লিং। আমি দেখছি, এ-কথা শুনে তোমার এাখনে আসতে লোভ হবে। তোমার মতো সুপুরুষ এখানকার মতো রূপমুগ্ধ দেশে এলে চতুর্দিকে উঠবে–

“. . . . . ঘন
নিশ্বাস প্রলয়বায়ু অশ্রুবারিধারা
আসার, জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব–”

যা হোক নিমন্ত্রণ-সভায় Miss–দ্বয় রূপসীশ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু তাঁর দু জনেই কেবন চুপচাপ গম্ভীর। বড়ো যে মেশামেশি হাসিখুশি তা ছিল না। ছোটো মিস একটা কৌচে গিয়ে হেলান দিয়ে বসলেন, আর বড়ো মিস দেওয়ালের কাছে এক চৌকি অধিকার করলেন। আমরা দুই এক জনে তাঁদের আমোদে রাখবার জন্যে নিযুক্ত হলুম। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি কথোপকথনশাস্ত্রে বিচক্ষণ নই, এখানে যাকে উজ্জ্বল বলে তা নই। গৃহকর্তা, একজন সংগীতশাস্ত্রজ্ঞতাভিমানিনী প্রৌঢ়া মহিলাকে বাজাতে অনুরোধের জন্যে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। গৃহের মহিলাদের মধ্যে তাঁর বয়স সব চেয়ে বেশি; তিনি সব-চেয়ে বেশি সাজগোজ করে এসেছিলেন, তাঁর দু হাতের দশ আঙুলে যতগুলো ধরে তত আংটি ছিল। আমি যদি নিমন্ত্রণকর্তা হতুম তা হলে তাঁর আংটির বাহুল্য দেখেই বুঝতে পারতুম যে তিনি পিয়ানো বাজাবেন বলে বাড়ি থেকে স্থিরসংকল্প হয়ে এসেছেন। তাঁর বাজনা সাঙ্গ হলে পর গৃহকর্ত্রী আমাকে গান গাবার জন্যে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন। আমি বড়ো মুশকিলে পড়লুম। আমি জানতুম, আমাদের দেশের গানের উপর যে তাঁদের বড়ে অনুরাগ আছে তা নয়। ভালোমানুষ হবার বিপদ এই যে নিজেকে হাস্যকরতা থেকে বাঁচানো যায় না। তাই মিস্টার টি–গান গাওয়ার ভূমিকা স্বরূপ দুই-একটি আরম্ভসূচক কাসি-ধ্বনি করলেন। সভা শান্ত হল। কোনোপ্রকারে কতর্ব্য পালন করলুম। সভাস্থ মহিলাদের এত হাসি পেয়েছিল যে, ভদ্রতার বাঁধ টলমল করছিল; কেউ কেউ হাসিকে কাসির রূপান্তরে পরিণত করলেন, কেউ কেউ হাত থেকে কী যেন পড়ে গেছে ভান করে ঘাড় নিচু করে হাসি লুকোতে চেষ্টা করলেন, এক জন কোনো উপায় না দেখে তার পার্শ্বস্থ সহচরীর পিঠের পিছনে মুখ লুকোলেন; যাঁরা কতকটা শান্ত থাকতে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে চোখে চোখে

টেলিগ্রাফ চলছিল। সেই সংগীতশাস্ত্রবিশারদ প্রৌঢ়াটির মুখে এমন একটু মৃদু তাচ্ছিল্যের হাসি লেগে ছিল যে, সে দেখে শরীরের রক্‌ত জল হয়ে আসে। গান যখন সাঙ্গ হল তখন আমার মুখ কান লাল হয়ে উঠেছে, চারদিক থেকে একটা প্রশংসার গুঞ্জনধ্বনি উঠল, কিন্তু অত হাসির পর আমি সেটাকে কানে তুললুম না। ছোটো মিস হ—আমাকে গানটা ইংরেজিতে অনুবাদ করতে অনুরোধ করলেন, আমি অনুবাদ করলেম। গানটা হচ্ছে “প্রেমের কথা আর বলো না।” তিনি অনুবাদটা শুনে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের দেশে প্রেমের স্বাধীনতা আছে নাকি। কতকগুলি রোমের ভগ্নাবশেষের ফটোগ্রাফ ছিল। সেইগুলি নিয়ে গৃহকর্ত্রী কয়েক জন অভ্যাগতকে জড়ো করে দেখাতে লাগলেন। ডাক্তার ম—একটা টেলিফোন কিনে এনেছেন, সেইটে নিয়ে তিনি কতকগুলি লোকের কৌতূহল তৃপ্ত করছেন। পাশের ঘরে টেবিলে খাবার সাজানো। এক-এক বার গৃহকর্তা এসে এক-এক জন পুরুষের কানে কানে বলে যাচ্ছেন, মিস অথবা মিসেস অমুককে নিশিভোজনে নিয়ে যাও; তিনি গিয়ে সেই মহিলার কাছে তাঁকে খাবার ঘরে নিয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করছেন ও তাঁর বাহুগ্রহণ করে তাঁকে পাশের ঘরে আহারস্থলে নিয়ে যাচ্ছেন। এ রকম সভায় সকলে মিলে এক বারে খেতে যায় না, তার কারণ তা হলে আমোদপ্রমোদের স্রোত অনেকটা বন্ধ হয়ে যায়। এই রকম এক সঙ্গে পুরুষ মহিলা সকলে মিলে গানবাজনা গল্প আমোদপ্রমোদ আহারাদিতে একটা সন্ধ্যা কাটানো গেল।

এখানে মিলনের উপলক্ষ্য কতপ্রকার আছে, তার সংখ্যা নেই। ডিনার, বল, conversazione, চা-সভা, লন পার্টি, এক্সকার্শন, পিনিক ইত্যাদি। থ্যাকারে বলেন, “English society has this eminent advantage over all others- that is if there be any society has this left in the wretched distracted old European continent- that it is above all others a dinner-giving society.” অবসর পেলে এক সন্ধ্যে বন্ধুবান্ধবদের জড়ো করে আহারাদি করা ও আমোদপ্রমোদ করে কাটানো এখানকার পরিবারের অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে।

ডিনার-সভার বর্ণনা করতে বসা বাহুল্য। ডাক্তার ম–র বাড়িতে যে পার্টির কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তার সঙ্গে ডিনার পার্টির প্রভেদ কেবল দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারে (এ ম্লেচ্ছদের দেশে ভক্ষণটা আবার দক্ষিণ বাম উভয় হস্তের ব্যাপার)। আমি একবার এখানকার একটি বোট-যাত্রা ও পিকনিক পার্টিতে ছিলুম। এখানকার একটি রবিবারিক সভার সভ্যেরা এই বোট-যাত্রার উদ্‌যোগী। এই সভার সভ্য এবং সভ্যরা রবিবার পালনের বিরোধী। তাই তাঁরা রবিবার একত্র হয়ে নির্দোষ আমোদপ্রমোদ করেন। এই রবিবারিক সভার সভ্য আমাদের এক বাঙালি মিত্র ম–মহাশয় আমাদের অনুগ্রহ করে টিকিট দেন। লণ্ডন থেকে রেলোয়ে করে টেমসের ধারে এক গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছলুম। গিয়ে দেখলুম টেমসে একটা প্রকাণ্ড নৌকো বাঁধা, আর প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন রবিবার-বিদ্রোহী মেয়েপুরুষে একত্র হয়েছেন। দিনটা অন্ধকার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আর যাঁদের আসবার কথা ছিল, তাঁরা সকলে আসেন নি। আমার নিজের এ পার্টিতে যোগ দিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ম–মহাশয় নাছোড়বান্দা। আমরা অনেক ভারতবর্ষীয় একত্র হয়েছিলুম, বোধ হয় ম–মহাশয় সকলকেই সুন্দরীর লোভ দেখিয়েছিলেন, কেন না সকলেই প্রায় বাহারে সাজগোজ করে গিয়েছিলেন। অনেকেই গলায় লাল ফাঁসি বেঁধেছিলেন। ম–মহাশয় স্বয়ং তাঁর নেকটাইয়ে একটি তলবারের আকারে পিন গুঁজে এসেছিলেন। আমাদের মধ্যে এক জন তাঁকে ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করলেন "দেশের সমস্ত টাইয়ে যে তলবারের আঘাত করা হয়েছে, ওটা কি তার বাহ্য লক্ষণ?" তিনি হেসে বললেন, "তা নয় গো, বুকের কাছে একটা কটাক্ষের ছুরি বিঁধেছে, ওটা তারই চিহ্ন।" দেশে থাকতে বিঁধেছিল, কি এখানে, তা কিছু বললেন না। ম–মহাশয়ের হাসিতামাশার বিরাম নেই; সেদিন তিনি স্টীমারে সমস্ত লোকের সঙ্গে সমস্‌ত দিন ঠাট্টা ও গল্প করে কাটিয়েছিলেন। এক বার তিনি মহিলাদের হাত দেখে গুনতে আরম্ভ করলেন। তখন তিনি বোটসুদ্ধ মেয়েদের এত প্রচুর পরিমাণে হাসিয়েছিলেন যে, সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর উপর আমার মনে মনে একটুখানি ঈর্ষার উদ্রেক হয়েছিল। যথাসময়ে বোট ছেড়ে দিল। নদী এত ছোটো যে, আমাদের দেশের খালের কাছাকাছি পৌঁছয়। স্টীমারের মধ্যে

আমাদের আলাপ-পরিচয় গল্পসল্প চলতে লাগল। একজন ইংরেজের সঙ্গে আমাদের এক জন দিশি লোকের ধর্মসম্বন্ধীয় তর্ক উঠল। আমাদের সঙ্গে এক জনের আলাপ হল, তিনি তাঁদের ইংরেজি সাহিত্যের কথা তুললেন, তাঁর শেলির কবিতা অত্যন্ত ভালো লাগে; সে-বিষয়ে আমার সঙ্গে তাঁর মতের মিল হল দেখে তিনি ভারি খুশি হলেন; তিনি আমাকে বিশেষ করে তাঁর বাড়ি যেতে অনুরোধ করলেন। ইনি ইংরেজি সাহিত্য ও তাঁর নিজের দেশের রজনীতি ভালোরকম করে চর্চা করেছেন, কিন্তু যেই ভারতবর্ষের কথা উঠল, অমনি তাঁর অজ্ঞতা বেরিয়ে পড়ল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন্ রাজার অধীনে।" আমি অবাক্ হয়ে বললুম, "ব্রিটিশ গবর্মেন্টের।" তিনি বললেন, "তা আমি জানি, কিন্তু আমি বলছি, কোন্ ভারতবর্ষীয় রাজার অব্যবহিত অধীনে।" কলকাতার বিষয়ে এর জ্ঞান এই রকম। তিনি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "আমার অজ্ঞতা মাপ করবেন, ভারতবর্ষের বিষয়ে আমাদের ঢের জানা উচিত ছিল, কিন্তু লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি আমি এ-বিষয়ে আমাদের ঢের জানা উচিত ছিল, কিন্তু লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি আমি এ-বিষয়ে খুব কব জানি।" এইরকম বোটের ছাতের উপর আমাদের কথাবার্তা চলতে লাগল; আমাদের মাথার উপরে একটা কানাতের আচ্ছাদন। মাঝে মাঝে টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে, কানাতের আচ্ছাদনে সেটা কতকটা নিবারণ করছে। যেদিকে বৃষ্টির ছাঁট পৌঁছচ্ছে না, সেইদিকে মেয়েদের রেখে আর এক পাশে এসে ছাতা খুলে দাঁড়ালুম। দেখি আমাদের দিশি বন্ধু ক—মশাশয় সেই মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। এই নিয়ে তাঁকে ঠাট্টা করাতে তিনি বার বার করে বললেন যে, বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়া ছাড়া তাঁর অন্য অভিসন্ধি ছিল না। কিন্তু কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। যা হক সেদিন আমরা বৃষ্টিতে তিন-চার বার করে ভিজেছি। এইরকম ভিজতে ভিজতে গম্যস্থানে গিয়ে পৌঁছলেম। তখন বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু আকাশে মেঘ আছে ও জমি ভিজে। মাঠে নেবে আমাদের খাওয়াদাওয়ার কথা ছিল, আকাশের ভাবগতিক দেখে তা আর হল না। আহারের পর আমরা নৌকো থেকে নেবে বেড়াতে বেরোলেম। কোনো কোনো প্রণয়ীযুগল একটি ছোটো পৌকো

নিয়ে দাঁড় বেয়ে চললেন, কেউ বা হাতে হাতে ধরে নিরিবিলি কানে কানে কথা কইতে কইতে মাঠে বেড়াতে লাগলেন। আমাদের সঙ্গে একজন ফটোগ্রাফওআলা তার ফোটোগ্রাফের সরঞ্জাম সঙ্গে করে এনেছিল, আমরা সমস্ত দল মাঠে দাঁড়ালেম, আমাদের ছবি নেওয়া হল। সহসা ম–মহাশয়ের খেয়াল গেল যে আমরা যতগুলি কৃষ্ণমূর্তি আছি, একত্রে সকলের ছবি নেওয়া হবে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন, তাঁরা এ প্রস্তাবে ইতস্তত করতে লাগলেন, এরকম একটা ইন্‌ভিডিয়স ডিসটিংসন তাঁদের মনঃপূত নয়; কিন্তু ম–মহাশয় ছাড়বর পাত্রে নন। অবশেষে স্টীমার লণ্ডন অভিমুখে ছাড়া হল। তখন ভগবান মরীচিমালী তাঁহার সহস্র রশ্মি সংযমন পুরঃসর অস্তাচল-চূড়াবলম্বী জলধরপটল-শয়নে বিশ্রান্ত মস্তক বিন্যাসপূর্বক অরুণ-বর্ণ নিদ্রাতুর লোচন মুদ্রিত করলেন; বিহগকূল স্ব স্ব নীড়ে প্রত্যাবর্তন করিল, গাভীবৃন্দ হাম্বারব করিতে করিতে গোপালের অনুবর্তন করিয়া গোষ্ঠাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। আমরা লণ্ডনের অভিমুখে যাত্রা করলেম।

য়ুরোপ-প্রবাসীর সপ্তম পত্র

এখানকার ধনী ফ্যাশনেবল মেয়েদের কথা একটু বলে নিই। তাঁদের দোরস্ত করতে হলে দিন-দুই আমাদের দিশি শাশুড়ির ও বিধবা ননদের হাতে রাখতে হয়। তাঁরা হচ্ছেন বড়োমানুষের মেয়ে কিংবা বড়োমানুষের স্ত্রী। তাঁদের চাকর আছে, কাজকর্ম করতে হয় না, একজন হাউস-কীপার আছে, সে বাড়ির সমস্ত ঘরকন্না তদারক করে, একজন নার্স আছে, সে ছেলেদের মানুষ করে, একজন গভর্নেস আছেন, তিনি ছেলেপিলেদের পড়াশুনা দেখেন ও অন্যান্য নানাবিধ বিষয়ে তদারক করেন; তবে আর পরিশ্রম করার কী রইল বলো। কেবল একটা বাকি আছে, সেটা হচ্ছে সাজসজ্জা; কিন্তু তার জন্য তাঁর লেডিজ মেড আছে, সুতরাং সেটাও সমস্তটা নিজের হাতে করতে হয় না। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত দিনটা তাঁর হাতে আস্ত পড়ে থাকে। সকালবেলায় বিছানায় পড়ে, দরজা-জানলা বন্ধ করে সূর্যের আলো আসতে না দিয়ে দিনটাকে কতকটা সংক্ষেপ করেন, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ব্রেকফাস্ট খান ও এগারোটার আগে শয়নগৃহ থেকে বেরোলে যথেষ্ট ভোরে উঠেছেন মনে করেন। তার পরে সাজসজ্জা; সে-বিষয়ে তোমাকে কোনো প্রকার খবর দিতে পারছি নে। শোনা যায় খুব সম্প্রতি বিলেতে স্নানটা ফ্যাশন হয়েছে কিন্তু এখনো এটা খুব কম দূর ব্যাপ্ত। সীমন্তিনীরা হাতের যতটুকু বেরিয়ে থাকে—মুখটি ও গলাটি—দিনের মধ্যে অনেকবার অতি যত্নে ধুয়ে থাকেন; বাকি অঙ্গ পরিষ্কার করবার তাঁরা তত আবশ্যক দেখেন না; কেননা মনোহরণের প্রধান সিঁধ মুখটিতে কোনোপ্রকার মরচে না পড়লেই হল। মাসে দু-বার একটা স্পঞ্জ-বাথ নিলেই তাঁরা যথেষ্ট মনে করেন। আমি কোনো ইংরেজ পরিবারের মধ্যে বাস করতে গিয়েছিলেম, আমি স্নান করি শুনে তাঁরা বিপন্ন হয়েছিলেন। কোনো প্রকার সনানের সরঞ্জাম ছিল না, সেজন্যে অগভীর একটা গোল জলাধার ধার করে আনতে হয়েছিল। বাড়িতে লোক দেখা করতে এলে তাদের সঙ্গে আলাপচারি করা গৃহিণীর কাজ, অনেক লোক একসঙ্গে এলে তাঁর কর্তব্য হচ্ছে তাঁর বাক্য ও হাসির অমৃত

সকলকে সমানভাবে বিতরণ করা, বিশেষ কারো সঙ্গে বেশি কথা কওয়া বা বিশেষ কাউকে বেশি যত্ন করাটা উচিত নয়। এ কাজটা অত্যন্ত দুরূহ, বোধ হয় অনেক অভ্যেসে দুরস্ত হয়। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি তাঁরা একজনের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা কন, তার পরে শেষ করেই সকলের দিকে চেয়ে একবার হাসেন, কখনো বা তাঁরা একজনের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা আরম্ভ করেন, তার পর বলতে বলতে এক এক বার করে সকলের মুখের দিকে চেয়ে একবার হাসেন, কখনো বা তাঁরা একজনের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা আরম্ভ করেন, তার পর বলতে বলতে এক এক বার করে সকলের মুখের দিকে চেয়ে নেন, কখনো বা, তাস খেলবার সময় যে-রকম করে চটপট তাস বিতরণ করে, তেমনি তাঁরা আগন্তুকদের একে একে করে একটি একটি কথার টুকরো ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেন, এমন তাড়াতাড়ি ও এমন দক্ষতার সঙ্গে যে, তাঁদের হাতে যে অনেক কথার তাস গোছানো রয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। এক জনকে বললেন, “ Lovely morning, isn't it?” তার পরেই তাড়াতাড়ি আর-এক জনের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, “কাল রাত্তিরে সংগীতশালায় মাডাম নীল্‌সন গান করেছিলেন, it was exquisite!” যতগুলি মহিলা ভিজিটর বসেছিলেন সকলে ঐ কথায় এক- একটা বিশেষণ যোগ করতে লাগলেন; এক জন বললেন “ charming,” এক জন বললেন “superb,” এক জন বললেন “ something unearthly,” আর-এক জন বাকি ছিলেন, তিনি বললেন “ Isn't it?” আমার বোধ হয়, এ এক-রকম সকালবেলা উঠে কথোপথনের মুগুর ভাঁজা। যা হক এই রকম মাঝে মাঝে ভিজিটর আনাগোনো করছে। মুডীজ লাইব্রেরীতে তিনি চাঁদা দিয়ে থাকেন। সেখান থেকে অনবরত ক্ষণজীবী নভেলগুলো তাঁর ওখানে যাতায়াত করে। সেগুলো অনবরত গলাধঃকরণ করেন। তা ছাড়া আছে ভালোবাসার অভিনয়। মিষ্টি হাসি ও মিষ্টি কথার আদান-প্রদান, অলীক ছুতো নিয়ে একটু অলীক অভিমান, হয়তো পুরুষ-পক্ষ থেকে একটু রসিকতা, অপর পক্ষে উদ্যত ক্ষুদ্র মুষ্টি সহযোগে সুমধুর লাঞ্ছনা, “ Oh you naughty, wicked, provoking man! ” তাতে নটি ম্যান-এর পরিপূর্ণ তৃপ্তি। এই রকম ভিজিটর অভ্যর্থনা, ভিজিট প্রত্যর্পণ, নতুন নভেল পড়া, নতুন

ফ্যাশন সৃষ্টি ও নতুন ফ্যাশনের অনুবর্তন করা, এবং তার সঙ্গে মধুর রস যোগ করে ফ্লার্ট এবং হয়তো ‘ লাভ’ করা তাঁদের দিনকৃত্য। আমাদের দেশে যেমন ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের বিয়ের জন্যে প্রস্তুত করে, যথেষ্ট লেখাপড়া শেখায় না, কেননা মেয়েদের আপিসে যেতে হবে না; এখানেও তেমনি মাগ্‌গি দরে বিকোবার জন্যে মেয়েদের ছেলেবেলা থেকে পালিশ করতে থাকে, বিয়ের জন্যে যতটকু লেখাপড়া শেখা দরকার ততটুকু যথেষ্ট। একটু গান গাওয়া, একটু পিয়ানো বাজানো, ভালো করে নাচা, খানিকটা ফরাসি ভাষা বিকৃত উচ্চারণ, একটু বোনা ও সেলাই করা জানলে একটি মেয়েকে বিয়ের দোকানের জানলায় সাজিয়ে রাখবার উপযুক্ত রংচঙে পুতুল গড়ে তোলা যায়। এ-বিষয়ে একটা দিশি পুতুল ও একটা বিলিতি পুতুলের যতটুকু তফাত, আমাদের দেশের ও এদেশের মেয়েদের মধ্যে ততটুকু তফাত, আমাদের দেশের ও এদেশের মেয়েদের মধ্যে ততটুকু তফাত মাত্র। আমাদের দিশি মেয়েদের পিয়ানো ও অন্যান্য টুকিটাকি শেখবার দরকার করে না, বিলিতি মেয়েদেরও অল্পস্বল্প লেখাপড়া শিখতে হয় কিন্তু দুই-ই দোকানে বিক্রি হবার জন্যে তৈরি। এখানেও পুরুষেরাই হর্তাকর্তা, স্ত্রীরা তাদের অনুগতা; স্ত্রীকে আদেশ করা, স্ত্রীর মনে লাগাম লাগিয়ে নিজের ইচ্ছামতো চালিয়ে বেড়ানো স্বামীরা ঈশ্বরনির্দিষ্ট অধিকার করেন। ফ্যাশনী মেয়ে ছাড়া বিলেতে আরো অনেক রকম মেয়ে আছে, নইলে সংসার চলত না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মেয়েদের অনেকটা মেহনত করতে হয়, বাবুয়ানা করলে চলে না। সকালে উঠে একবার রান্নাঘর তদারক করতে হয়, সে-ঘর পরিষ্কার আছে কি না, জিনিসপত্র যথাপরিমিত আনা হয়েছে কি না, যথাস্থানে রাখা হয়েছে কি না ইত্যাদি দেখাশুনো করা; রান্না ও খাবার জিনিস আনতে হুকুম দেওয়া, পয়সা বাঁচাবার জন্যে নানাপ্রকার গিন্নিপনার চাতুরী খেলা, কালকের মাংসের হাড়গোড় কিছু যদি অবশিষ্ট থাকে তা হলে বন্দোবস্ত করে তার থেকে অজকের সূপ চালিয়ে নেওয়া, পরশু দিনকার বাসি রাঁধা মাংস যদি

খাওয়া-দাওয়ার পর খানিকটা বাকি থাকে তা হলে সেটাকে রূপান্তরিত করে আজকের টেবিলে আনবার সুবিধে করে দেওয়া, এইরকম নানাপ্রকার গৃহিণীপনা। তার পর ছেলেদের জন্য মোজা কাপড়-চোপড়, এমন কি নিজেরও অনেক কাপড় নিজে তৈরি করেন। এঁদের সকলের ভাগ্যে নভেল পড়া ঘটে ওঠে না; বড়োজোর খবরের কাগজ পড়েন, তাও সকলে পড়েন না দেখেছি; অনেকের পড়াশুনোর মধ্যে কেবল চিঠি পড়া ও চিঠি লেখা, দোকানদারদের বিল পড়া ও হিসাব লেখা। তাঁরা বলেন, "পলিটিক্‌স এবং অন্যান্য গ্রাম্ভারি বিষয় নিয়ে পুরুষেরা নাড়াচাড়া করুন; আমাদের কর্তব্য কাজ স্বতন্ত্র।" দুর্বলতা মেয়েদের একটা গর্বের বিষয়; সুতরাং অনেক মেয়ে শ্রান্ত না হলেও এলিয়ে পড়েন। বুদ্ধিবিদ্যার বিষয়েও এইরকম; মেয়েরা জাঁক করে বলেন, "আমরা বাপু ও-সব বুঝিসুঝি নে।" বিদ্যার অভাব, বুদ্ধির খর্বতা একটা প্রকাশ্য জাঁকের বিষয় হয়ে ওঠে। এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েরা বিদ্যাচর্চার দিকে ততটা মনোযোগ দেন না, তাঁদের স্বামীরাও তার জন্যে বড়ো দুঃখিত নন, তাঁদের জীবন হচ্ছে কতকগুলি ছোটোখাটো কাজের সমষ্টি। সন্ধ্যেবেলায় স্বামী কর্মক্ষেত্র থেকে এলে একটি আদরের চুম্বন উপার্জন করেন; (পরিবার-বিশেষে যে তার অন্যথা হয় তা বলাই বাহুল্য) ঘরে তাঁর জন্যে আগুন জ্বালানো, খাবার সাজানো আছে। সন্ধ্যেবেলায় স্ত্রী হয়তো একটা সেলাই নিয়ে বসলেন, স্বামী তাঁকে একটি নভেল চেঁচিয়ে পড়ে শোনাতে লাগলেন, সুমুখে আগুন জ্বলছে, ঘরটি বেশ গরম, বাইরে পড়ছে বৃষ্টি, জানলা-দরজাগুলি বন্ধ। হয়তো স্ত্রী পিয়ানো বাজিয়ে স্বামীকে খানিকটা গান শোনালেন। এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গিন্নিরা সাদাসিদে। যদিও তাঁরা ভালো করে লেখাপড়া শেখেন নি, তবু তাঁরা অনেক বিষয় জানেন, এবং তাঁদের বুদ্ধি যথেষ্ট পরিষ্কার। এদেশে কথায় বাতায় জ্ঞানলাভ করা যায়, তাঁরা অন্তঃপুরে বদ্ধ নন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপ শেখেন নি, তবু তাঁরা অনেক বিষয় জানেন, এবং তাঁদের বুদ্ধি যথেষ্ট পরিষ্কার। এদেশে

কথায় বার্তায় জ্ঞানলাভ করা যায়, তাঁরা অন্তঃপুরে বদ্ধ নন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপ করেন, আত্মীয়- সভায় একটা কোনো উচ্চ বিষয় নিয়ে চর্চা হলে তাঁরা শোনেন ও নিজের বক্তব্য বলতে পারেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা একটা বিষয়ের কত দিক দেখেন ও কী রকম চক্ষে দেখেন তা বুঝতে পারেন। সুতরাং একটা কথা উঠলে কতকগুলো ছেলেমানুষি আকাশ-থেকে-পড়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না ও তাঁকে হাঁ করে থাকতে হয় না। বন্ধুবান্ধদের সঙ্গে খুব সহজভাবে গল্পসল্প করতে পারেন, নিমন্ত্রণসভায় মুখ ভার করে বা লজ্জায় অবসন্ন হয়ে থাকেন না, পরিচিতদের সঙ্গে অন্যায় ঘেঁষাঘেঁষি নেই, কিংবা তাদের কাছ থেকে নিতান্ত অসামাজিক ভাবে দূরেও থাকেন না। লোকসমাজে মুখটি খুব হাসিখুশি, প্রসন্ন; যদিও নিজে খুব রসিকা নন, কিন্তু হাসিতামাশা বেশ উপভোগ করতে পারেন, একাট কিছু ভালো লাগলে মন খুলে প্রশংসা করেন, একটা কিছু মজার কথা শুনলে প্রাণ খুলে হাস্য করেন।

আমি দিনকতক আমার শিক্ষকের পরিবারের মধ্যে বাস করেছিলুম, সে বড়ো অদ্ভুত পরিবার। মিষ্টার ব-মেধ্যবিত্ত লোক। তিনি লাটিন ও গ্রীক খুব ভালো রকম জানেন। তাঁর ছেলেপিলে কেউ নেই; তিনি, তাঁর স্ত্রী, আমি, আর এক জন দাসী, এই চার জন মাত্র একটি বাড়িতে থাকতুম। কর্তা আধবুড়ো লোক, অত্যন্ত অন্ধকার মূর্তি, দিনরাত খুঁতখুঁত খিট খিট করেন, নিচের তলায় রান্নাঘরের পাশে একটি ছোট্টো জানলাওয়ালা দরজা-বদ্ধ অন্ধকার ঘরে থাকেন। একে তো সূর্যকিরণ সে ঘরে সহজেই প্রবেশ করতে পারে না, তাতে জানলার উপরে একটা পর্দা ফেলা, চারদিকে পুরোনো ছেঁড়া ধুলোমাখা নানাপ্রকার আকারের ভীষণদর্শন গ্রীক লাটিন বইয়ে দেয়াল ঢাকা, ঘরে প্রবেশ করলে এক রকম বদ্ধ হাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠতে হয়। এই ঘরটা হচ্ছে তাঁর স্টাডি, এইখানে তিনি পড়েন ও পড়ান। তাঁর মুখ সর্বদাই বিরক্ত। আঁট বুটজুতো পরতে বিলম্ব হচ্ছে, বুটজুতোর উপর চটে ওঠেন; যেতে যেতে দেয়ালের পেরেকে তাঁর পকেট আটকে যায়, রেগে ভুরু কুঁকড়ে ঠোঁট নাড়তে থাকেন। তিনি যেমন খুঁতখুঁতে মানুষ, তাঁর পক্ষে তেমনি খুঁতখুঁতের কারণ প্রতি পদে জোটে। আসতে যেতে হুঁচট খান, অনেক টানাটানিতে তাঁর দেরাজ খোলে না,

যদি বা খোলে তবু যে-জিনিস খুঁজছিলেন তা পান না। এক-এক দিন সকালে তাঁর স্টাডিতে এসে দেখি, তিনি অকারণে বসে বসে ভ্রূকুটি করে উঁ আঁ করছেন, ঘরে একটি লোক নেই। কিন্তু ব–আসলে ভালোমানুষ; তিনি খুঁতখুঁতে বটে, রাগী নন, খিটখিট করেন কিন্তু ঝগড়া করেন না। নিদেন তিনি মানুষের উপর রাগ প্রকাশ করেন না, টাইনি বলে তাঁর একটি কুকুর আছে তার উপরেই তাঁর আক্রোশ। সে একটু নড়লে চড়লে তাকে ধমকাতে থাকেন, আর দিনরাত তাকে লাথিয়ে লাথিয়ে একাকার করেন। তাঁকে আমি প্রায় হাসতে দেখি নি। তাঁর কাপড়চোপড় ছেঁড়া অপরিষ্কার। মানুষটা এই রকম। তিনি এক-কালে পাদরি ছিলেন; আমি নিশ্চয় বলতে পারি, প্রতি রবিবারে তাঁর বক্তৃতায় তিনি শ্রোতাদের নরকের বিভীষিকা দেখাতেন। তাঁর এত কাজের ভিড়, এত লোককে পড়াতে হত যে, এক-এক দিন তিনি ডিনার খেতে অবকাশ পেতেন না। এক-এক দিন তিনি বিছানা থেকে উঠে অবধি রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এমন অবস্থায় খিটখিটে হয়ে ওঠা কিছু আশ্চর্য নয়। গৃহিণী খুব ভালোমানুষ, রাগী উদ্ধত নন, এককালে বোধ হয় ভালো দেখতে ছিলেন, যত বয়স তার চেয়ে তাঁকে বড়ো দেখায়, চোখে চশমা, সাজগোজের বড়ো আড়ম্বর নেই। নিজে রাঁধেন, বাড়ির কাজকর্ম করেন, ছেলেপিলে নেই, সুতরাং কাজকর্ম বড়ো বেশি নয়। আমাকে খুব যত্ন করতেন। খুব অল্প দিনেতেই বোঝা যায় যে, দম্পতির মধ্যে বড়ো ভালোবাসা নেই, কিন্তু তাই বলে যে দু-জনের মধ্যে খুব বিরোধ ঘটে তাও নয়, অনেকটা নিঃশব্দে সংসার চলে যাচ্ছে। মিসেস ব–কখনো স্বামীর স্টাডিতে যান না; সমস্ত দিনের মধ্যে খাবার সময় ছাড়া দু-জনের দেখাশুনা হয় না, খাবার সময়ে দু-জনে চুপচাপ বসে থাকেন। খেতে খেতে আমার সঙ্গে গল্প করেন, কিন্তু দু-জনে পরস্পর গল্প করেন না। ব–র আলুর দরকার হয়েছে, তিনি চাপা গলায় মিসেসকে বললেন, “ some potatoes “ please কথাটা বললেন না কিংবা শোনা গেল না)। মিসেস ব–বলে উঠলেন “ I wish you were a little more polite “ ব–বললেন “ I did say 'please “; মিসেস ব–বললেন “ I did not here it “; ব–বললেন “ it was no fault of mine”। এইখানেই দুই পক্ষ চুপ করে রইলেন। মাঝে থেকে আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুতে পড়ে যেতেম। একদিন আমি ডিনারে যেতে একটু দেরি করেছিলেম, গিয়ে দেখি, মিসেস ব–ব–কে ধমকাচ্ছেন, অপরাধের মধ্যে তিনি মাংসের সঙ্গে একটু

বেশি আলু নিয়েছিলেন। আমাকে দেখে মিসেস ক্ষান্ত হলেন, মিস্টার সাহস পেয়ে শোধ তোলবার জন্যে দ্বিগুণ করে আলু নিতে লাগলেন, মিসেস তাঁর দিকে নিরুপায় মর্মভেদী কটাক্ষপাত করলেন। দুই পক্ষই দুই পক্ষকে যথারীতি ডিয়ার ডার্লিং বলে ভুলেও সম্বোধন করেন না, কিংবা কারো ক্রিশ্চান নাম ধরে ডাকেন না, পরস্পর পরস্পরকে মিস্টর ব—ও মিসেস ব—বলে ডাকেন। আমার সঙ্গে মিসেস হয়তো বেশ কথাবার্তা কচ্ছেন, এমন সময় মিস্টার এলেন, অমনি সমস্ত চুপচাপ। দুই পক্ষেই এই রকম। একদিন মিসেস আমাকে পিয়ানো শোনাচ্ছেন, এমন সময় মিস্টার এসে উপস্থিত; বললেন " When are you going to stop?" মিসেস বললেন "I thought you had gone out"। পিয়ানো থামল। তার পরে আমি যখন পিয়ানো শুনতে চাইতেম মিসেস বলতেন, "that horrid man যখন বাড়িতে না থাকবেন তখন শোনাব", আমি ভারি অপ্রস্তুতে পড়ে যেতুম। দু-জনে এই রকম অমিল অথচ সংসার বেশ চলে যাচ্ছে। মিসেস রাঁধছেন বাড়ছেন কাজকর্ম করছেন, মিস্টার রোজগার করে টাকা এনে দিচ্ছেন; দু-জনে কখনো প্রকৃত ঝগড়া হয় না, কেবল কখনো কখনো দুই-এক বার দুই একটা কথা-কাটাকাটি হয়, তা এত মৃদুস্বরে যে পাশের ঘরের লোকের কানে পর্যন্ত পৌঁছয় না। যা হক আমি সেখানে দিনকতক থেকে বিব্রত হয়ে সে অশান্তির মধ্যে থেকে চলে এসে বেঁচেছি।

য়ুরোপ-প্রবাসীর অষ্টম পত্র

আমারা এখন লণ্ডন ত্যাগ করে এসেছি। লণ্ডনের জনসমুদ্রে জোয়ারভাঁটা খেলে তা জান? বসন্তের আরম্ভ থেকে গরমির কিছুদিন পর্যন্ত লণ্ডনের জোয়ার-ঋতু। এই সময়ে লণ্ডন উৎসবে পূর্ণ থাকে—থিয়েটার নাচগান, প্রকাশ্য ও পারিবারিক ‘বল’, আমোদপ্রমোদে ঘেঁষাঘেঁষি ঠেসাঠেসি। ধনী লোকদের বিলাসিনী মেয়েরা রাতকে দিন করে তোলে। আজ তাদের নাচে নেমন্তন্ন, কাল ডিনারে, পরশু থিয়েটার,তরশু রাত্তিরে ম্যাডাম প্যাটির গান, দিনের চেয়ে রাত্তিরের ব্যস্ততা বেশি। সুকুমারী মহিলা, যাঁদের তিলমাত্র শ্রম লাঘবের জন্যে শত শত ভক্ত সেবকের দল দিনরাত্রি প্রাণপণ করছেন—চৌকিটা সরিয়ে দেওয়া, প্লেটটা এগিয়ে দেওয়া, দরজাটা খুলে দেওয়া, মাংসটা কেটে দেওয়া, পাখাটা কুড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি—তাঁরা রাত্তিরের পর রাত্তির ন-টা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত গ্যাসের ও মানুষের নিশ্বাসে গরম ঘরের মধ্যে অবিশ্রান্ত নৃত্যে রত; সে আবার আমাদের দশের অলস নড়েচড়ে বেড়ানো বাইনাচের মতো নয়, অনবরত ঘুরপাক। ললিতা রমণীরা কী করে টিকে থাকেন, আমি তাই ভাবি। এই তো গেল আমোদপ্রমোদ, তা ছাড়া এই সময়ে পার্লামেন্টের অধিবশেন। ব্যাণ্ডের একতান স্বর, নাচের পদশব্দ, ডিনার-টেবিলের হাস্যালাপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র একটা পোলিটিকাল উত্তেজনা। স্থিতিশীল ও গতিশীল দলভুক্তরা প্রতি রাত্রের পার্লামেন্টের রাজনৈতিক মল্লযুদ্ধের বিবরণ কী আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করতে থাকে। সীজ্‌নের সময় লণ্ডনে এই রকম আলোড়ন। তার পরে আবার ভাঁটা পড়তে আরম্ভ হয়, লণ্ডনের কৃষ্ণপক্ষ আসে। তখন আমোদ-কোলাহল বন্ধ হয়ে যায়, বাকি থাকে অল্পস্বল্প লোক, যাদের শক্তি নেই, বা দরকার আছে বা বাইরে যাবার ইচ্ছে নেই। সেই সময়ে লণ্ডন থেকে চলে যাওয়া একটা ফ্যাশন। আমি একটা বইয়ে (“Sketches and Travels in London” : Thackeray) পড়েছিলুম, এই সময়টাতে অনেকে যারা নগরে থাকে তারা বাড়ির সম্মুখে দরজা জানলা সব বন্ধ করে বাড়ির পিছনদিকের ঘরে লুকিয়ে-চুরিয়ে বাস করে। দেখাতে চায় তারা লণ্ডন ছেড়ে চলে গেছে। সাউথ কেনসিংটন বাগানে যাও; ফিতে, টুপি, পালক, রেশম, পশম ও গাল-রং-করা

মুখের সমষ্টি চোখ ঝলসে প্রজাপতির ঝাঁকের মতো বাগান আলো করে বেড়াচ্ছে না; বাগান তেমনি সবুজ আছে, সেখানে তেমনি ফুল ফুটেছে, কিন্তু তার সজীব শ্রী নেই। গাড়ি ঘোড়া লোকজনের হিজিবিজি ঘুচে গিয়ে লণ্ডনটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। সম্প্রতি লণ্ডনের সীজ্‌ন অতীত, আমরাও লণ্ডন ছেড়ে টন্‌ব্রিজ ওয়েল্‌স বলে একটা আধা-পাড়াগেঁয়ে জায়গায় এসেছি। অনেক দিনের পর হালকা বাতাস খেয়ে বাঁচা গেল। হাজার হাজার চিমনি থেকে অবিশ্রান্ত পাথুরে কয়লার ধোঁয়া ও কয়লার গুঁড়ো উড়ে উড়ে লণ্ডনের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করেছে। রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাত ধুলে সে হাত-ধোয়া জলে বোধ করি কালির কাজ করা যায়। নিশ্বাসের সঙ্গে অবিশ্রান্ত কয়লার গুঁড়ো টেনে মগজটা বোধ হয় অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ হয়ে দাঁড়ায়। টন্‌ব্রিজ ওয়েল্‌স অনেক দিন থেকে তার লৌহপদার্থমিশ্রিত উৎসের জন্যে বিখ্যাত। এই উৎসের জল খাবার জন্যে এখানে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। উৎস শুনেই আমরা কল্পনা করলেম—না জানি কী সুন্দর দৃশ্য হবে; চারিদিকে পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, সারসমরাকুল-কূজিত, কলমকুমুদকহলার-বিকশিত সরোবর, কোকিল-কূজন, মলয়-বীজন, ভ্রমর-গুঞ্জন ও অবশেষে এই মনোরম স্থানে পঞ্চশরের প্রহার ও এক ঘটি জল খেয়ে বাড়ি ফিরে আসা। গিয়ে দেখি, একটা হাটের মধ্যে একটা ছোটো গর্ত পাথর দিয়ে বাঁধানো, সেখানে একটু একটু করে জল উঠছে, একটা বুড়ি কাঁচের গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে। এক এক পেনি নিয়ে এক-এক গেলাস জল বিতরণ করছে ও অবসরমতো একটা খবরের কাগজে গতরাত্রের পার্লামেন্টের সংবাদ পড়ছে। চারদিকে দোকানবাজার; গাছপালার কোনো সম্পর্ক নেই; সম্মুখেই একটা কসাইয়ের দোকান, সেখানে নানা চতুস্পদের ও "হংসমরালকুল" এর ডানা ছাড়ানো মৃতদেহ দড়িতে ঝুলছে; এই সব দেখে আমার মন এমন চটে উঠল যে, কোনোমতে বিশ্বাস হল না যে, এ জলে কোনোপ্রকার রোগ নিবারণ বা শরীরের উন্নতি হতে পারে।

টন্‌ব্রিজ ওয়েল্‌স শহরটা খুব ছোটো, দু-পা বেরোলেই গাছপালা মাঠ দেখতে পাওয়া যায়। বাড়িগুলো লণ্ডনের মতো থামবারান্দাশূন্য, ঢালু ছাত-ওআলা সারি সারি একঘেয়ে ভাবে দাঁড়িয়ে; অত্যন্ত শ্রীহীন দেখতে। দোকানগুলো তেমনি

সুসজ্জিত, পরিপাটি, কাঁচের জানলা দেওয়া। কাঁচের ভিতর থেকে সাজানো পণ্যদ্রব্য দেখা যাচ্ছে; কসাইয়ের দোকানে কোনোপ্রকার কাঁচের আবরণ নেই, চতুষ্পদের আস্ত আস্ত পা ঝুলছে-ভেড়া, গোরু, শুওর, বাছুরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নানাপ্রকার ভাবে চোখের সামনে টাঙিয়ে রাখা, হাঁস প্রভৃতি নানাপ্রকার মরা পাখি লম্বা লম্বা গলাগুলো নিচের দিকে ঝুলিয়ে আছে, আর খুব একটা জোয়ান পেটমোটা ব্যক্তি হাতে একটা প্রকাণ্ড ছুরি নিয়ে কোমরে একটা আঁচলা ঝুলিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

বিলেতের ভেড়াগোরুগুলো তাদের মোটাসোটা মাংসচর্বিওআলা শরীরের ও সুস্বাদের জন্যে বিখ্যাত, যদি কোনো মানুষ-খেগো সভ্যজাত থাকত, তা হলে বোধ হয় বিলেতের কসাইগুলো তাদের হাটে অত্যন্ত মাগ্‌গি দামে বিকোত। একজন মেমসাহেব বলেন যে, কসাইয়ের দোকান দেখলে তাঁর অত্যন্ত তৃপ্তি হয়; মনে আশ্বাস হয়, দেশে আহারের অপ্রতুল নেই, দেশের পেট ভরবার মতো খাবার প্রচুর আছে, দুর্ভিক্ষের কোনো সম্ভাবনা পেই। ইংরেজদের খাবার টেবিলে যে রকম আকারে মাংস এনে দেওয়া হয়, সেটা আমার কাছে দুঃখজনক। কেটে-কুটে মসলা দিয়ে মাংস তৈরি করে আনলে একরকম ভুলে যাওয়া যায় যে একটা সত্যিকার জন্তু খেতে বসেছি; কিন্তু মুখ-পা বিশিষ্ট আস্ত প্রাণীকে অবিকৃত আকারে টেবিলে এনে দিলে একটা মৃতদেহ খেতে বসেছি বলে গা কেমন করতে থাকে।

নাপিতের দোকানের জানলায় নানাপ্রকার কাঠের মাথায় নানাপ্রকার কোঁকড়ানো পরচুলো বসানো রয়েছে, দাড়িগোঁফ ঝুলছে, মার্কামারা শিশিতে টাক-নাশক চুল-উঠে-যাওয়া-নিবারক অব্যর্থ ওষুধ রয়েছে; দীর্ঘকেশী মহিলারা এই দোকানে গেলে সেবকরা (সেবিকা নয়) তাঁদের মাথা ধুয়ে দেবে, চুল বেঁধে দেবে, চুল কুঁকড়ে দেবে। এখানে মদের দোকানগুলোই সব-চেয়ে জমকালো, সন্ধ্যের সময় সেগুলো আলোয় আকীর্ণ হয়ে যায়, বাড়িগুলো প্রায় প্রকাণ্ড হয়, ভিতরটা খুব বড়ো ও সাজানো, খদ্দেরের ঝাঁক দোকানের বাইরে ও ভিতরে সর্বদাই, বিশেষত সন্ধ্যেবেলায় লেগে থাকে। দরজির দোকানও মন্দ নয়। নানা ফ্যাশনের সাজসজ্জা কাঁচের জানলার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে, বড়ো বড়ো কাঠের মূর্তিকে কাপড় পরিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে; মেয়েদের কাপড়চোপড় এক দিকে ঝোলানো; এইখানে কত লুব্ধ নেত্র দিনরাত্রি তাকিয়ে আছে তার সংখ্যা নেই, এখানকার

বিলাসিনীরা, যাদের নতুন ফ্যাশনের দামি কাপড় কেনবার টাকা নেই, তারা দোকানে এসে কাপড়গুলো ভালো করে দেখে যায়, তার পরে বাড়িতে গিয়ে সস্তায় নিজের হাতে তৈরি করে।

আমাদের বাড়ির কাছে একটা খোলা পাহাড়ে জায়গা আছে; সেটা কমন অর্থাৎ সরকারি জায়গা; চারিদিক খোলা, বড়ো গাছ খুব অল্প; ছোটো ছোটো গুলেমর ঝোপ ও ঘাসে পূর্ণ, চারিদিক সবুজ, বিচিত্র গাছপালা নেই বলে কেমন ধূ ধূ করছে, কেমন বিধবার মতো চেহারা। উঁচুনিচু জমি, কাঁটাগাছের ঝোপঝাপ, জায়গাটা আমার খুব ভালো লাগে। মাঝে মাঝে এইরকম কাঁটা-খোঁচা এবড়ো-খেবড়োর মধ্যে এক-এক জায়গায় ব্লুবেল্‌স নামক ছোটো ছোটো ফুল ঘেঁষাঘেঁষি ফুটে সবুজের মধ্যে স্তূপাকার নীল রং ছড়িয়ে রেখেছে, কোথাও বা ঘাসের মধ্যে রাশ রাশ সাদা ডেজি ও হল্‌দে বাটার-কাপ অজস্র সৌন্দর্যে প্রকাশিত। ঝোপঝাপের মাঝে মাঝে এবং গাছের তলায় এক-একটা বেঞ্চি পাতা। এইটে সাধারণের বেড়াবার জায়গা। এখানে মানুষ এত অল্প ও জায়গা এত বেশি যে ঘেঁষঘেঁষি নেই। লণ্ডনের বড়ো বড়ো বেড়াবার বাগানের মতো চারদিকেই ছাতা-হস্তক, টুপি-মস্তক, চোখ-ধাঁধক ভিড়ের আনাগোনা নেই; দূরদূর বেঞ্চির মধ্যে নিরালা যুগলমূর্তি রোদ্দুরে এক ছাতার ছায়ায় আসীন; কিংবা তারা হাতধরাধরি করে নিরিবিলি বেড়াচ্ছে।

সবসুদ্ধ জড়িয়ে জায়গাটা উপভোগ্য। এখনো গরমিকাল শেষ হয় নি। এখানে গরমিকালে সকাল ও সন্ধ্যে অত্যন্ত সুন্দর। গরমির পূর্ণযৌবনের সময় রাত দুটো-তিনটের পরে আলো দেখা দিতে আরম্ভ করে, চারটের সময় রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে ও রাত্রি ন-টা দশটার আগে দিনের আলো নেবে না। আমি একদিন পাঁচটার সময় উঠে কমন-এ বেড়াতে গিয়েছিলুম। পাহাড়ের উপর একটা গাছের তলায় গিয়ে বসলুম, দূরে ছবির মতো ঘুমন্ত শহর, একটুও কুয়শা নেই। নির্জন রাস্তাগুলি, গির্জের উন্নত চূড়া, রৌদ্ররঞ্জিত বাড়িগুলি নীল আকাশের পটে যেন একটি কাঠে খোদাই করা ছবির মতো আঁকা। আসলে এই শহরটা কিছুই ভালো দেখতে নয়; এখানকার বাড়িগুলোতে জানলা-কাটা-কাটা চারটে দেয়াল, একটা ঢালু ছাদ ও তার উপরে ধোঁয়া বেরোবার কতকগুলি কুশ্রী নল। ক্রমে ক্রমে যতই বেলা হতে লাগল শত শত চিমনি থেকে অমনি ধোঁয়া বেরোতে লাগল, ধোঁয়াতে ক্রমে শহরটা

অস্পষ্ট হয়ে এল, রাস্তায় ক্রমে মানুষ দেখা দিল, গাড়িঘোড়া ছুটতে আরম্ভ হল, হাতগাড়ি কিংবা ঘোড়ার গাড়িতে করে দোকানিরা মাংস রুটি তরকারি বাড়ি বাড়ি বিতরণ করে বেড়াতে লাগল (এখানে দোকানিরা বাড়িতে বাড়িতে জিনিসপত্র দিয়ে আসে), ক্রমে কমন-এ লোক জমতে শুরু হল, আমি বাড়ি ফিরে এলেম।

এখানে আমার একটি শখের বেড়াবার জায়গা আছে। গাড়ির চাকার দাগে এবড়ো-খেবড়ো উঁচুনিচু পাহাড়ে রাস্তা, দুধারে ব্ল্যাকবেরী ও ঘন লতা-গুলেমর বেড়া, বড়ো বড়ো গাছে ছায়া করে আছে, রাস্তার আশেপাশে ঘাস ও ঘাসের মধ্যে ডেজি প্রভৃতি বুনো ফুল। শ্রমজীবীরা ধুলোকাদা-মাখানো ময়লা কোট-প্যান্টলুন ও ময়লা মুখ নিয়ে আনাগোনা করছে, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে লাল লাল ফুলো ফুলো মুখে বাড়ির দরজার বাইরে কিংবা রাস্তায় খেলা করছে—এমন মোটাসোটা গোলগাল ছেলে কোনো দেশে দেখি নি। এক-একটা বাড়ির কাছে ছোটো ছোটো পুকুরের মতো, সেখানে পোষা হাঁসগুলো ভাসছে। মাঠগুলো যদিও পাহাড়ে, উঁচুনিচু, কিন্তু চষা জমি সমতল ও পরিষ্কার। ঘাসগুলো অত্যন্ত সবুজ ও তাজা, এখানে রৌদ্র তীব্র নয় বলে ঘাসের রং আমাদের দেশের মতন জ্বলে যায় না, তাই এখানকার মাঠের দিকে চেয়ে থাকতে অত্যন্ত ভালো লাগে, অজস্র স্নিগ্ধ সমুজ রঙে চোখ যেন ডুবে যায়। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো গাছ ও সাদা সাদা বাড়িগুলো দূর থেকে ছোটো ছোটো দেখাচ্ছে। এই রকম শূন্য মাঠ ছাড়িয়ে অনেক দূরে এসে এক-একটা প্রকাণ্ড পাইন গাছের অরণ্য পাওয়া যায়, ঘেঁষাঘেঁষি গাছে অনেক দূর জুড়ে অন্ধকার, খুব গম্ভীর, খুব নিস্তব্ধ।

য়ুরোপ-প্রবাসীর নবম পত্‌র

গরমিকাল। সুন্দর সূর্য উঠেছে। এখন দুপুর দুটো বাজে। আমাদের দেশের শীতকালের দুপুরবেলাকার বাতাসের মতো বেশ একটি মিষ্টি হাওয়া, রোদ্দুরে চারদিক ঝাঁঝাঁ করছে। এমন ভালো লাগছে আর এমন একটু কেমন উদাস ভাব মনে আসছে যে কী বলব।

আমরা এখন ডেভনশিয়রের অন্তর্গত টর্কি বলে এক নগরে আছি। সমুদ্রের ধারে। চারদিকে পাহাড়। অতি পরিষ্কার দিন। মেঘ নেই, কুয়াসা নেই, অন্ধকার নেই; চারিদিকে গাছপালা, চারিদিকে পাখি ডাকছে, ফুল ফুটছে। যখন টন্‌ব্রিজ ওয়েল্‌সে ছিলুম, তখন ভাবতুম এখানে যদি মদন থাকে, তবে অনেক বনবাদাড় ঝোপঝাপ কাঁটাগাছ হাতড়ে দু-চারটে বুনো ফুল নিয়েই কোনোমতে তাকে ফুলশর বানাতে হয়। কিন্তু টর্কিতে মদন যদি গ্যাটলিং কামানের মতো এমন একটা বাণ উদ্ভাবন করে থাকে, যার থেকে প্রতি মিনিটে হাজারটা করে তীর ছোঁড়া যায় আর সেই বাণ দিনরাত যদি কাজে ব্যস্ত থাকে, তবু মদনের ফুলশরের তহবিল এখানে দেউলে হবার কোনো সম্ভাবনা নেই, এত ফুল, যেখানে-সেখানে, পথে-ঘাটে, ফুল মাড়িয়ে চলতে হয়। আমরা রোজ পাহাড়ে বেড়াতে যাই। গোরু চরছে, ভেড়া চরছে; এক-এক জায়গায় রাস্তা এত ঢালু যে, উঠতে-নাবতে কষ্ট হয়। এক-এক জায়গায় খুব সংকীর্ণ পথ, দু ধারে গাছ উঠেছে আঁধার করে, ওঠবার সুবিধের জন্যে ভাঙা ভাঙা সিঁড়ির মতন আছে, পথের মধ্যেই লতা গুল্ম উঠেছে। চারদিকে মধুর রোদ্দুর। এখানকার বাতাস বেশ গরম, ভারতবর্ষ মনে পড়ে। এইটুকু গরমেই লণ্ডনের প্রাণীদের চেয়ে এখানকার জীবজন্তুদের কত নির্জীব ভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। ঘোড়াগুলো আস্তে আস্তে যাচ্ছে, মানুষগুলোর তেমন ভারি ব্যস্ত ভাব নেই, গড়িমসি করে চলেছে।

এখানকার সমুদ্রের ধার আমার বড়ো ভালো লাগে। যখন জোয়ার আসে, তখন সমুদ্রতীরের খুব প্রকাণ্ড পাথরগুলো জলে ডুবে যায়, তাদের মাথা বেরিয়ে থাকে। ছোটো ছোটো দ্বীপের মতো দেখায়। জলের ধারেই ছোটো বড়ো কত পাহাড়। ঢেউ লেগে লেগে পাহাড়ের নিচে গুহা তৈরি হয়ে গেছে; যখন ভাঁটা পড়ে

যায়, তখন আমরা এক-এক দিন এই গুহার মধ্যে গিয়ে বসে থাকি। গুহার মধ্যে জায়গায় জায়গায় অতি পরিষ্কার একটু জল জমে রয়েছে, ইতস্তত সমুদ্র-শৈবাল জমে আছে, সমুদ্রের একটা স্বাস্থ্যজনক গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, চারদিকে পাথর ছড়ানো। আমরা সবাই মিলে এক-এক দিন সেই পাথরগুলো ঠেলাঠেলি করে নাড়াবার চেষ্টা করি, নানা শামুক ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে আসি। এক একটা পাহাড় সমুদ্রের জলের উপর খুব ঝুঁকে পড়েছে; আমরা প্রাণপণ করে এক এক দিন সেই অত দুর্গম পহাড়গুলোর উপর উঠে বসে নিচে সমুদ্রের ঢেউয়ের ওঠাপড়া দেখি। হু হু শব্দ উঠেছে, ছোটো ছোটো নৌকো পাল তুলে চলে যাচ্ছে, চারদিকে রোদ্দুর, মাথার উপর ছাতা খোলা, পাথরের উপর মাথা দিয়ে আমরা শুয়ে শুয়ে গল্প করছি। আলস্যে কাল কাটাবার এমন জায়গা আর কোথায় পাব? এক-এক দিন পাহাড়ে যাই, আর পাথর-দিয়ে-ঘেরা ঝোপেঝাপে-ঢাকা একটি প্রচ্ছন্ন জায়গা দেখলে সেই খাদটিতে গিয়ে বই নিয়ে পড়তে বসি।

য়ুরোপ-প্রবাসীর দশম পত্র

ক্রিস্‌মাস ফুরোল, আবার দেখতে দেখতে আর-একটা উৎসব এসে পড়ল। আজ নূতন বর্ষের প্রথম দিন। কিন্তু তার জন্যে কিছুই গোলমাল দেখতে পাচ্ছি নে। নূতন বৎসর যে এখানে এমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আসবে তা জানতেম না। শুনেছি ফ্রান্সে লোকে নতুন বৎসরকে খুব সমাদরের সঙ্গে আবাহন করে। কাল পুরাতন বৎসরের শেষ রাত্রে আমাদের প্রতিবেশীরা বাড়ির জানলা খুলে রেখেছিল। পাছে পুরোনো বৎসর ঘরের মধ্যে আটকা পড়ে থাকে, পাছে নতুন বৎসর এসে জানলার কাছে বৃথা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

টর্কি থেকে বহুদিন হল আমরা আবার লণ্ডনে এসেছি। এখন আমি ক—র পরিবারের মধ্যে বাস করি। তিনি, তাঁর স্ত্রী, তাঁদের চার মেয়ে, দুই ছেলে, তিন দাসী, আমি ও টেবি বলে এক কুকুর নিয়ে এই বাড়ির জনসংখ্যা। মিস্টার ক—একজন ডাক্তার। তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি প্রায় সমস্ত পাকা। বেশ বলিষ্ঠ ও সুশ্রী দেখতে। অমায়িক স্বভাব, অমায়িক মুখশ্রী। মিসেস ক—আমাকে আন্তরিক যত্ন করেন। শীতের সময় আমি বিশেষ গরম কাপড় না পারলে তাঁর কাছে ভর্ৎসনা খাই। খাবার সময় যদি তাঁর মনে হয়, আমি কম করে খেয়েছি, তা হলে যতক্ষণ না তাঁর মনের মতো খাই, ততক্ষণ পীড়াপীড়ি করেন। বিলেতে লোকে কাশিকে ভয় করে; যদি দৈবাৎ আমি দিনের মধ্যে দু-বার কেশেছি তা হলেই তিনি জোর করে আমার স্নান বন্ধ করান, আমাকে দশ রকম ওষুধ গেলান, শুতে যাবার আগে আমার পায়ে খানিকটা গরম জল ঢালবার বন্দোবস্ত করেন, তবে ছাড়েন। বাড়ির মধ্যে সকলের আগে বড়ো মিস ক—ওঠেন। তিনি নিচে এসে ব্রেকফাস্ট তৈরি হয়েছে কি না তদারক করেন; অগ্নি-কুণ্ডে দু-চার হাতা কয়লা দিয়ে ঘরটি বেশ উজ্জ্বল করে রাখেন। খানিক বাদ সিঁড়িতে একটা দুদ্দাড় পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। বুড়ো ক—শীতে হি হি করতে করতে খাবার ঘরে এসে উপস্থিত। তাড়াতাড়ি আগুনে হাত-পা পিঠ-বুক তাতিয়ে খবরের কাগজ হাতে খাবার টেবিলে এসে বসেন। তাঁর বড়ো মেয়েকে চুম্বন করেন, আমার সঙ্গে সুপ্রভাত অভিবাদন হয়। লোকটা প্রফুল্ল। আমার সঙ্গে

খানিকটা হাসিতামাশা হয়, খবরের কাগজ থেকে এটা-ওটা পড়ে শোনান। তাঁর এক পেয়ালা কফি শেষ হয়ে গেছে, এমন সময়ে তাঁর আর দুটি মেয়ে এসে তাঁকে চুম্বন করলেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্দোবস্ত ছিল যে, তাঁরা যেদিন মিস্টার ক–র আগে উঠবেন, সেদিন মিস্টার ক–তাঁদের পাঁচ সিকে পুরস্কার দিবেন, আর যেদিন মিস্টার ক–তাঁদের আগে উঠবেন, সেদিন তাঁদের চার আনা দণ্ড দিতে হবে। যদিও এত অল্প দিতে হয়, তবু তাদের কাছে প্রায় দু-তিন পাউণ্ড পাওনা হয়েছে। রোজ সকালে পাওনাদার পাওনার দাবি করেন। কিন্তু দেনদাররা হেসেই উড়িয়ে দেন। ক–বলেন, “এ ভারি অন্যায়।” আমাকে মাঝে মাঝে মধ্যস্থ মেনে বলেন, “আচ্ছা মিস্টার টি–তুমিই বলো, এ-রকম ডেট অফ অনর ফাঁকি দেওয়া কি ভদ্রতা?” যা হোক পরিশোধের অভাবে পাওনা বেড়েই চলেছে। তার পরে মিসেস ক–এলেন। আমাদের ব্রেকফাস্ট প্রায় সাড়ে ন-টার মধ্যে শেষ হয়। বাড়ির বড়ো ছেলে আগেই খাওয়া সেরে কাজে গিয়েছেন, আর মিস্টার ক–র ছোটো ছেলেটি ও ছোটো মেয়েটি অনেকক্ষণ হল খাওয়া শেষ করেছে। একজনের কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। টেবি কুকুরটি অনেকক্ষণ হল এসে আগুনের কাছে বসে আছে। ছোট্টো কুকুরটি। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রোঁয়া। রোঁয়াতে চোখমুখ ঢাকা। বুড়ো হয়েছে, আর তার একটা চোখ কানা হয়ে গেছে। আদর পেয়ে পেয়ে এই ব্যক্তির অভ্যাস হয়েছে নবাবি চাল। ড্রয়িংরুম ছাড়া অন্য কোনো ঘরে তার মন বসে না। ঘরের সকলের চেয়ে আলো কেদারাটিতে অম্লানবদনে লাফিয়ে উঠে বসে, এক পাশে যদি আর কেউ এসে বসল, অমনি সে সদর্পে পাশের কৌচটির উপরে গিয়ে বসে পড়ে। সকালবেলায় ব্রেকফাস্টের সময় তার তিনটি বিস্কুট বরাদ্দ। সে বিস্কুটগুলি নিয়ে খাবার ঘরে বসে থাকে, যতক্ষণ না আমি গিয়ে সেই বিস্কুটগুলি নিয়ে তার সঙ্গে খানিকটা খেলা করি, একবার তার মুখ থেকে কেড়ে নিই একবার গড়িয়ে দিই। আগে আগে যখন আমার উঠতে দেরি হত, সে তার বরাদ্দ বিস্কুট নিয়ে আমার শোবার ঘরের কাছে বসে ঘেউ ঘেউ করত। কিন্তু গোল করলে বিরক্ত হতুম দেখে সে এখন আর ঘেউ ঘেউ করে না। আস্তে আস্তে পা দিয়ে দরজা ঠেলে, যতক্ষণ না দরজা খুলে দিই চুপ করে বাইরে বসে থাকে। দরজা খুলে ঘর থেকে বেরোলেই লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে

লেজ নেড়ে উৎসাহ প্রকাশ করে; তার পরে একবার বিস্কুটের দিকে চায় একবার আমার মুখের দিকে। যা হোক সাড়ে ন-টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট শেষ হয়। তার পরে হাতে দস্তানা পরা গৃহিণী দাসীদের নিয়ে তাঁর চৌতলা থেকে একতলা পর্যন্ত, জিনিসপত্র গুছিয়ে ঘরদ্বার পরিষ্কার ও গৃহকার্য তদারক করে ওঠা-নাবায় প্রবৃত্ত। একবার রান্নাঘরে যান, সেখানে শাকওআলা, রুটিওআলা, মাংসওআলার বিল দেখেন, দেনা চুকিয়ে দেন। মাঝে মাঝে উপরে এসে কর্তার সঙ্গে গৃহকার্যের পরামর্শ হয়। রান্নাঘরের উপকরণ পরিষ্কার আছে কি না ও যথাস্থানে তাদের রাখা হয়েছে কি না দেখেন, ভালো মাংস এনেছে কি না, ওজনে কম পড়েছে কি না তদন্ত করেন। রাঁধুনীর সঙ্গে মাঝে মাঝে যোগ দেন। এইরকম ব্রেকফাস্টের পর থেকে প্রায় বেলা একটা-দেড়টা পর্যন্ত তাঁকে নানাবিধ কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে তাঁর বড়ো মেয়ে যোগ দেন। মেজো মেয়ে প্রত্যহ একটি ঝাড়ন নিয়ে ড্রয়িংরুম সাফ করেন। দাসীরা ঘর ঝাঁট দিয়ে যায়, আর জিনিসপত্রে যা কিছু ধুলো লাগে তা তিনি নিজের হাতে ঝেড়ে-ঝুড়ে সাফ করেন। তৃতীয় মেয়ে বালিশের আচ্ছাদন আসন মোজা কাপড় প্রভৃতি নানাবিধ সেলাইয়ে নিযুক্ত হন, চিঠিপত্র লেখেন, এক-এক দিন বাজনা ও গান অভ্যাস করেন। বাড়ির মধ্যে তিনিই গাইয়ে বাজিয়ে। আজকাল স্কুল বন্ধ, ছোটো ছেলেটি ও মেয়েটি ভারি খেলায় মগ্ন। দেড়টার সময় আমাদের লাঞ্চ খাওয়া সমাপন হলে আবার যিনি যাঁর কাজে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ঝিটিরদের আসবার সময়। হয়তো মিসেস ক—তাঁর স্বামীর এক জোড়া ছেঁড়া মোজা দিয়ে চশমা পরে ড্রয়িংরুমে বসে সেলাই করছেন। ছোটো মেয়ে একটি পশমের জামা তাঁর ভাইপোর জন্যে তৈরি করে দিচ্ছেন। মোজো মেয়েটি একটু অবসর পেয়ে আগুনের কাছে বসে হয়তো গ্রীনের লিখিত ইংরেজ জাতির ইতিহাস পড়তে নিযুক্ত। বড়ো মিস ক—হয়তো তাঁর কোনো আলাপীর বাড়িতে ভিজিট করতে গিয়েছেন। তিনটের সময় হয়তো একজন ভিজিটর এলেন। দাসী ড্রয়িংরুমে এসে নাম উচ্চারণ করলে “মিস্টার ও মিসেস এ—” বলতে বলতে ঘরের মধ্যে তাঁরা দু-জনে উপস্থিত। মোজা জামা রেখে বই মুড়ে গৃহিণী ও তাঁর কন্যারা আগন্তুকদের অভ্যর্থনা করলেন। আবহাওয়া সম্বন্ধে পরস্পরের মতামতের

ঐক্য নিয়ে আলাপ শুরু হল। মিসেস এ—বললেন, “মিস্টার এক্‌স—এর তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে হাম হয়। হাম হয়েছিল বলে তিন চারদিন আপিসে যেতে পারেন নি। কাল আপিসে গিয়েছিলেন। তাঁর হামের প্রসঙ্গে আপিসের লোকেরা তাঁকে নির্দয়রূপে ঠাট্টা করতে আরম্ভ করেছে।” অন্যেরা লোকটি সম্বন্ধে দরদ প্রকাশ করলে। এই কথা থেকে ক্রমে হামরোগের বিষয়ে যত কথা উঠতে পারে উঠল। মিস ক—খবর দিলেন মিস্টার জ—এর যে এক পিতৃব্য বোন মিস ই—অস্ট্রেলিয়ায় আছেন, তাঁর কাপ্তেন ব—এর সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেছে। এই রকম খানিকক্ষণ কথোপকথন হলে পর তাঁরা চলে গেলেন। বিকেলে হয়তো আমরা সবাই মিলে একটু বেড়াতে গেলুম। বেড়িয়ে এসে সাড়ে ছ-টার সময় আমাদের ডিনার। ডিনার খেয়ে সাতটার সময় আমরা সবাই মিলে ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসি। আগুন জ্বলছে। ঘরটি বেশ গরম হয়ে উঠেছে। আমরা আগুনের চারদিকে ঘিরে বসলুম। এক-এক দিন আমাদের গান-বাজনা হয়। আমি ইতিমধ্যে অনেক ইংরেজি গান শিখেছি। আমি গান করি। মিস ক—আমাকে অনেকগুলি গান শিখিয়েছেন। কিন্তু প্রায় সন্ধ্যেবেলায় আমাদের একটু আধটু পড়াশুনো হয়। আমরা পালা করে ছ-দিনে ছ-রকমের বই পড়ি। বই পড়তে পড়তে এক-এক দিন প্রায় সাড়ে এগারোটা বারোটা হয়ে যায়।

ছেলেদের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে। তারা আমাকে আর্থার বুড়ো বলে। এথেল ছোটো মেয়েটির ইচ্ছে যে আমি কেবল একলা তারই আঙ্ক্‌ল্‌ আর্থার হই। তার ভাই টম যদি আমাকে দাবি করে তবেই তার দুঃখ। একদিন টম তার ছোটো বোনকে রাগাবার জন্যে একটু বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিল, আমারই আঙ্ক্‌ল্‌ আর্থার। তখনই এথেল আমার গলা জড়িয়ে ধরে ঠোঁট দুটি ফুলিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে দিলে। টম একটু অস্থির, কিন্তু ভারি ভালোমানুষ। খুব মোটাসোটা। মাথাটা খুব প্রকাণ্ড। মুখটা খুব ভারি ভারি। সে এক-এক সময়ে আমাকে এক-একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, “আচ্ছা, আঙ্ক্‌ল্‌ আর্থার, ইঁদুররা কী করে?” আঙ্ক্‌ল্‌ বললেন, “তারা রান্নাঘর থেকে চুরি করে খায়।” সে

একটু ভেবে বললে, “চুরি করে? আচ্ছা, চুরি করে কেন?” আঙ্কল্ বললেন, “তাদের খিদে পায় বলে।” শুনে টমের বড়ো ভালো লাগল না। সে বারবার শুনে আসছে যে, জিজ্ঞাসা না করে পরের জিনিস নেওয়া অন্যায়। আর-একটি কথা না বলে সে চলে গেল। যদি তার বোন কখনো কাঁদে, সে তাড়াতাড়ি এসে সান্ত্বনার স্বরে বলে, “Oh poor Ethel, don’t you cry! Poor Ethel! “ এথেলের মনে মনে জ্ঞান আছে যে, সে একজন লেডি। সে কেমন গম্ভীরভাবে কেদারায় ঠেস দিয়ে বসে। টমকে এক-এক সময়ে ভর্ৎসনা করে বলে, “আমাকে বিরক্ত করো না।” একদিন টম পড়ে গিয়ে কাঁদছিল। আমি তাকে বললেন, “ছি, কাঁদতে আছে!” অমনি এথেল আমার কাছে ছুটে এসে জাঁক করে বললে, “আঙ্কল্ আর্থার, আমি একবার ছেলেবেলায় রান্নাঘরে পড়ে গিয়েছিলেম, কিন্তু কাঁদি নি।” ছেলেবেলায়!

মিস্টার ন–, ডাক্তারের আর এক ছেলে, বাড়িতে থাকেন কিন্তু তাঁকে দেখতে পাই নে। তিনি সমস্ত দিন আপিসে। আপিস থেকে এলেও তাঁর বড়ো একটা দেখা পাওয়া যায় না। তার কারণ মিস্ ই–র সঙ্গে তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ। তাঁদের দু-জনে কোর্টশিপ চলছে। রবিবার দু-বেলা প্রেয়সীকে নিয়ে তাঁর চার্চে যেতে হয়। যখন বিকেলে একটু অবসর পান, প্রণয়িনীর বাড়িতে গিয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে আসেন। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যেবেলা তাঁদের বাড়িতে তাঁর নেমন্তন্ন। এই রকমে তাঁর সময় ভারি অল্প। উভয়ে পরস্পরকে নিয়ে এমন সুখী আছেন যে, অবসরকাল কাটাবার জন্যে অন্য কোনো জীবের সঙ্গ তাঁদের আবশ্যক করে না। শুক্রবার সন্ধ্যেবেলায় যদি আকাশ ভেঙে পড়ে তবু মিস্টার ন–পরিষ্কার করে চুলটি ফিরিয়ে, পমেটম মেখে, কোট ব্রাস করে ফিটফাট হয়ে ছাতা হাতে বাড়ি থেকে বেরোবেনই। একবার খুব শীত পড়েছিল, আর তাঁর ভারি কাশি হয়েছিল; মনে করলেম, আজ বুঝি বেচারির আর যাওয়া হয় না। সাতটা বাজতে না বাজতেই দেখি তিনি ফিটফাট হয়ে নেবে এসেছেন।

যা হোক, আমার এই পরিবারের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। সেদিন মেজো মেয়ে আমাকে বলছিলেন যে, প্রথম যখন তাঁরা শুনলেন যে, একজন ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক তাঁদের মধ্যে বাস করতে আসছে, তাঁদের ভারি ভয় হয়েছিল। যেদিন

আমার আসবার কথা সেই দিন মেজো ও ছোটো মেয়ে, তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় এক হপ্তা বাড়িতে আসেন নি। তার পর হয়তো যখন তাঁরা শুনলেন যে, মুখে ও সর্বাঙ্গে উল্কি নেই, ঠোঁট বিঁধিয়ে অলংকার পরে নি, তখন তাঁরা বাড়িতে ফিরে এলেন। ওঁরা বলেন যে প্রথম প্রথম এসে যদিও আমার সঙ্গে কথাবার্তা কয়েছিলেন তবুও দু-দিন পর্যন্ত আমার মুখ দেখেন নি। হয়তো ভয় হয়েছিল যে কী অপূর্ব ছাঁচে ঢালাই মুখই না জানি দেখবেন। তার পর যখন মুখ দেখলেন–তখন?

যা হোক, এই পরিবারে সুখে আছি। সন্ধ্যেবেলা আমোদে কেটে যায়–গান-বাজনা, বই পড়া। আর এথেল তার আঙ্কল্ আর্থারকে মুহূর্ত ছেড়ে থাকতে চায় না।